একক ৭ ❑ নাৎসি উত্থান এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য
৭.১ প্রস্তাবনা
৭.২ জার্মানি (১৯১৯-৩৩)
৭.২.১ জার্মান প্রজাতন্ত্র
৭.২.১ নাৎসি উত্থান
৭.৩ ইতালি (১৯১৯-২৫)
৭.৩.১ যুদ্ধোত্তর ইতালি ও সমাজবাদী শাসন
৭.৩.২ ফ্যাসিবাদের উত্থান
৭.৪ সারাংশ
৭.৫ অনুশীলনী

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানির রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।
- জার্মানিতে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ও তার সমস্যা, উনিশশো বিশের দশকের জার্মানির অর্থনৈতিক সংকট।
- যুদ্ধোত্তর সমাজব্যবস্থার নানা টানাপোড়েনে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিস্তার।
- উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ নাৎসি দলের উত্থান এবং অ্যাডলফ হিটলারর ভূমিকা।
- নির্বাচনের মাধ্যমে নাৎসিদের ক্ষমতা দখল এবং নাৎসি সংগঠনে হিটলারের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন।
- প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি।
- ইতালিতে সামজবাদী শাসনের সূত্রপাত ও তার সমস্যা
- ইত্যালতে ফ্যাসিবাদের উত্থান
- ফ্যাসিবাদী উত্থানে বেনিতো মুসোলিনির ভূমিকা এবং তার রোম অভিযান।
- ফ্যাসিবাদী আদর্শ।
- ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখল এবং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনের প্রক্রিয়া।

৭.২ প্রস্তাবনা

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে একনায়কতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের উত্থান বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়। নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ত ইতালির যে অবয়ব এই শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে

দেখা গেল তার সূত্রপাত ঘটেছিল সমকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের নেপথ্যের কারণ সমূহ এই পর্বে বুঝতে চাওয়া হবে। আলোচ্য এককে দেখান হবে যে কিভাবে ঘটনা পরম্পরার জটিল বিন্যাস ও সমকালীন বাস্তব রাজনীতির ক্রমবিকাশ জার্মানি ইতালিসহ সমগ্র ইউরোপের যুদ্ধের পথে পুনর্যাত্রাকে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল।

৭.২ জার্মানি (১৯১৯-৩৩)

মহাযুদ্ধের পর ভাইমারে (Weimar) অনুষ্ঠিত সংবিধান সভা থেকে জন্ম নিল জার্মান প্রজাতন্ত্র। ১৯১৯ সালে এর সৃষ্টি, এবং ১৯৩৩ সলে নাৎসিরা ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত ভাইমার প্রজাতন্ত্রই জার্মানির সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে মহাযুদ্ধের পরবর্তী চার বছরের বিপর্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক চাপের কারণে প্রজাতান্ত্রিক শাসন বারংবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯৩০-৩৩ এই কালপর্বে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিপদ এর জীবনীশক্তিকে বহুলাংশে হরণ করেছিল।

৭.২.১ জার্মান প্রজাতন্ত্র

মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের এক বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা তৎকালীন জার্মান জনমানসকে অনেককাংশে আচ্ছান্ন করে রেখেছিল। সে সময়ে এমন একটি ধারণা জার্মানিতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধে জার্মানির কোন প্রকার সামরিক পরাজয় ঘটেনি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে করা হত যে, উদারপন্থী ও সমাজবাদী নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও 'পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত' (Dolchstoss) এযাবৎ অপরাজেয় জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটিয়েছে। এই ধরনের কল্পনাশ্রয়ী ধারণার প্রেক্ষিতে ভার্সাই সন্ধির শর্ত জার্মান সমাজে আরও বেশি অপমানজনক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে সমাজবাদ ও উদারপন্থার বিরোধী তথা সেনাবাহিনীর সর্বময় ক্ষমতার সমর্থক জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিসাবে পরিচিত নাৎসি দল। জার্মানির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং যুদ্ধে পরাজয়জনিত আর্থিক বিপর্যয় ছাপিয়ে একধরনের স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার ও যেনতেন প্রকারেণ ভার্সাই ব্যবস্থার ধ্বংস-সাধনের আকাঙ্খা জার্মানিতে মুখ্য হয়ে ওঠে। এও ভাবা হয়েছিল যে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে জার্মান অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে বিজয়ী শক্তিগুলো সদয় ও সক্রিয় হবে। এই ধরনের কল্পনা এক প্রকারের বাস্তববোধ-বিবর্জিত, রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াধর্মী জাতীয় মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

বিশ শতকের তৃতীয় দসকে জার্মানি অতি দ্রুত অতীতের পরাজয়কে নাকচ করে অগ্রসর হতে চায়। সেনাবাহিনীর ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব, জার্মান আমলাতন্ত্র, বৃহৎ পুঁজির মালিক, বৃহৎ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর স্বার্থের এক উল্লেখযোগ্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে প্রাক্তন চ্যান্সেলর কাপের ক্ষমতা দখলের প্রয়াস (Kapp Putech) এই লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হলেও শেষাবধি সফল হয়নি। বাইরের পৃথিবীর কাছে এই অসাফল্য জার্মান গণতন্ত্রের শক্তির প্রমাণ বলে মনে হলেও জার্মানির অভ্যন্তরে এর মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়। এর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রাইখস্টাগে প্রজাতন্ত্রীদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বস্তুত তৎকালীন জার্মান প্রতিনিধিসভায় সাবেক দলগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামবদল করে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাবেক প্রগ্রেসিভরা গণতন্ত্রী নাম নিয়ে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও বিশেষ জনসমর্থম লাভ করেনি। সামাজিক গণতন্ত্রীরাও নতুন কিছু করে দেখাতে পারেনি। সর্বাধিক জনসমর্থন সত্ত্বেও কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক

আন্দোলন করা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না। ক্যাথলিক সেন্টার পার্টি চিরাচরিত ভাবে ক্যাথলিক চার্চের জন্য সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। তারা সর্বদা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সাথে আপোষ করে চলতে গিয়ে প্রতিবাদের ভাষাই হারিয়ে ফেলেছিল। সাম্যবাদী দল রোজা লুক্সেমবার্গের মৃত্যুর পর নেতৃত্বহীনতায় 'জাতীয় ভাবাবেগ'কে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, এবং কমিনটার্নের বাধ্যবাধ্যকায় চলতে গিয়ে কার্যত শ্রমিক শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একমাত্র জোতদার শিল্পপতি রক্ষণশীলদের স্বার্থবাহী 'জাতীয়' দলই এই কালপর্বে জনসমর্থনের নিরিখে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছিল।

১৯২০-র দশতের মধ্যেভাগে জার্মান অর্থনীতি এক বৈপরীত্যময় অবস্থানে পৌঁছেছিল। তীব্র মুদ্রাস্ফীত ছিল এ সময়ের লক্ষণ। একদিকে, জার্মানি যেমন ১৯২৪ সাল নাগাদ সব ধরনের ঋণমুক্ত হয়, পাশাপাশি ধনী অংশকে অক্ষত রেখে মধ্যবত্তি ও দরিদ্রতর শ্রেণীর ওপর চাপান করের বোঝা সমাজে আর্থিক বৈষম্যকে তীব্রতর করে। জার্মান ধনী শিল্পপতি শ্রেণী হয়ে ওঠে অর্থনীতির নিয়ন্তা আগামী দিনে এরাই হয়ে উঠবে নাৎসি দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ. জে. পি. টেলরের মতে, মুদ্রস্ফীতিই এককভাবে প্রজাতন্ত্রের পতনের জন্য দায়ী। মিত্রশক্তির নীতির কারণে নয়, বরং ধনিক শ্রেণীর ওপর প্রত্যক্ষ কর চাপাতে না পারার ব্যর্থতাই প্রজাতন্ত্রের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। মুদ্রাস্ফীতির বিরোধিতা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এসময়ের দেশপ্রেমের মাপকাঠি অন্যকি জার্মানিতে নাগরিক জীবনবিমুখী ও ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন আদর্শের বিস্তার চলতে থাকে। জার্মান জাতির সর্বোৎকৃষ্টতার ধারণা উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ইহুদী বিদ্বেষে জারিত এই মতাদর্শের (Volkisch folk) প্রভাবে জার্মানির নানা স্থানে সংগঠন তৈরি হয়। বাভেরিয়া ছিল এর প্রাণকেন্দ্র। আর্থিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার প্রকোপ সর্বত্র লক্ষ করা যায়। এইরকম বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতিতে ১৯২৩ সালের অক্টোবরে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে স্যাক্সনি, থুরিঞ্জিইয়ার অভ্যুত্থান অবশ্য সফল হতে পারেনি।

১৯২৩-২৯ কালপর্বটিকে জার্মান প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সফলকাম অধ্যায় বলা যেতে পারে। যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তবে তার মধ্যেও সামরিক খাতে জার্মানির ব্যয় ব্রিটেনের তুলনায় বেশি ছিল। ১৯২৯ সাল নাগাদ জার্মান জীবনযাত্রার মান ছিল পূর্বের তুলনায় উন্নততর। কয়লা ও লোহা উৎপাদন প্রাক্ মহাযুদ্ধ সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হয়েছিল। সাহিত্যিক টমাস মান, বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বা ঐতিহাসিক ফ্রিডরিশ মাইনকে প্রমুখের সৃষ্টিধর্মিতা এযুগেই দেখা গিয়েছিল।

তবে শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার এই কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল অনাগত ধ্বংসের বীজ। জার্মান অর্থনীতি ছিল অতিরিক্তভাবে ভারী শিল্পনির্ভর। পূর্বের কার্টেলগুলোর (Kartel) স্থান নিয়েছিল বৃহত্তর একচেটিয়ী উদ্যোগ। অতিমাত্রায় সামরিকীকরণের ঝোঁক বিকল্প অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেদেয়। এই পর্বে জার্মান রাষ্ট্রবিদ গুস্তাভ স্ট্রেসিমান ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যমণি। তাঁর নীতি 'Policy of fulfilment' নামে পরিচিত। এর দ্বারা জার্মানি অন্তত কয়েক বছরের জন্য যুদ্ধের হাত রেহাই পেয়েছিল। মুদ্রা স্থিতিশীল হল এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য এল। রাইনল্যান্ড অঞ্চলে ফরাসী অধিকারের বিরুদ্ধে 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' রদ করে তিনি জার্মান অর্থনীতিকে তখনকারমত কিছুটা রক্ষা করলেন। স্বল্পকাল চ্যান্সেলর হিসাবে এবং বিদেশমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল স্ট্রেসিমান উদারপন্থী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা ছিলেন। পুঁজিবাদ ও উদারবাদের প্রতি তার অনুরাগ তাকে যথাক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর ও মধ্যবর্গের আস্থা অর্জনে বাধা দিয়েছিল। বিদেশনীতিতে স্ট্রেসিমানের ভূমিকা সাময়িকভাবে প্রজাতন্ত্রের সাফল্য বলে বিবেচিত হলেও কালক্রমে সেই বিদেশনীতিই কার্যত

প্রজাতন্ত্রের পতন ও ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯২৯ সালে স্ট্রেসিমানের মৃত্যুর পর থেকে জার্মানি প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে অবসানের পথে এগিয়ে চলে।

১৯৩০ সালের মার্চ মাসে চ্যান্সেলর হিসাবে ব্রুনিংয়ের মনোনয়নকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অবসান ধরা যেতে পারে। সামরিক নেতৃত্ব, বিশেষত জেনারেল কুর্ট ফন শ্লাইখারের কৌশলে জার্মানিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। সমসাময়িককালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা (১৯২৯-'৩৩) প্রজাতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছিল। সেনাবাহিনী এরপর থেকে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এরই রেশ ধরে পরবর্তী অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমে সাময়িকভাবে ও পরে পূর্ণাঙ্গ অর্থে একনায়কতন্ত্র কায়েম হল।

৭.২.২ নাৎসি উত্থান

জার্মানিতে নাসিদের উত্থানের ঘটনা চমকপ্রদ। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় জার্মান জনসাধারণকে বেদনাহত করেছিল। পূর্ববর্তী চার বছর ধরে লালিত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জার্মান সমাজের হতাশা ও দুর্দশার দিনে এক ধরনের পশ্চাৎমুখী সুখাশ্রয়ী অতীতকল্পনা-বিভোর গণমানসিকতা জার্মানির সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। জার্মানির 'হৃতগৌরব' পুনরুদ্ধারের আবেগকে সম্বল করে যে সমস্ত সংগঠনের বাড়বৃদ্ধি ঘটে তার অন্যতম ছিল আন্তন ড্রেক্সলার পরিচালিত জার্মান শ্রমিক দল (DAP)। এই দলের সদস্য হিসাবে অ্যাডলফ হিটলার দক্ষিণের বাভেরিয়া অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধি করতে থাকেন। ইতিপূর্বে মিউনিখ ও ভিয়েনার থাকার সময় হিটলার যে ধরনের আদর্শের সাথে পরিচিত হচ্ছিলেন তা পূর্ণতা পেল DAP দলে এসে। ড্রেক্সলার ও হিটলারের সম্মিলিত প্রয়াসে ২৫ দফা কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে DAP নব কলেবর ধারণ করল জাতীয় সমাজবাদী জার্মান শ্রমিক দল (NSDAP) বা নাৎসি (Nazi) দল হিসাবে। শীঘ্রই মিউনিখ শহরকে কেন্দ্র করে হিটলারের নেতৃত্বে আবর্তিত হতে লাগল সমগ্র আন্দোলনটি। অন্যান্য সংগঠন কার্যত NSDAP-র উপগ্রহে পরিণত হল।

নাৎসিদের ক্ষমতারোহনের ভিত্তি ছিল বাভেরিয়া প্রদেশ তথা দক্ষিণ জার্মানি। ১৯২৩ সালে ক্ষমতা দখলের প্রবল প্রয়াস চালায় NSDAP। তদানীন্তন জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কার্যক্রম ও জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নাৎসি দল ধারণা করে যে অদূর ভবিষ্যতে জার্মানিতেও সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। ক্রমাগত হিটলার ও তার সহযোগী দক্ষিণপন্থী দলগুলির চাপে প্রথমে বাভেরিয়ায় ও পরে সমগ্র জার্মানিতে জরুরি অবস্থা জারী করা হয়। হিটলার ও সমধর্মীদের জোট কাম্ফবুন্ডের (Kampfbund) উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে হিটলার ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে বাভেরিয়ার সামরিক ও অসামরিক কর্তৃকক্ষকে 'জাতীয় বিপ্লবে' অংশগ্রহম করতে বাধ্য করেন। শুরু হয় তথাকথিত 'মিউনিখ পুশ' (Munich Putsch)। তবে সেনাবাহিনীর সমর্থনের অভাবে তা ব্যর্থ হতে দেরী লাগেনি। হিটলার গ্রেফতার হন। সাময়িকভাবে তাঁর ক্ষমতাদখলের প্রয়াসের অবসান ঘটে। হিটলার বন্দী থাকাকালীন গুস্তাভ স্ট্রেসারের নেতৃত্বে পার্টি পরিচালিত হয় এবং ১৯২৪ সালের নির্বাচনে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে সমঝোতা করা হয়। কৃষক ও কারিগরদের মধ্যে দলীয় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে স্ট্রেসারে ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে হিটলার দেশ জুড়ে NSDAP-র ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। একটানা প্রজাতান্ত্রিক সরকার, সাম্যবাদ ও ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করেন Volkischer Beobachter পত্রিকায়। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে উত্তর জার্মানিতেও তার প্রভাব বৃদ্ধি পেল। বামবার্গ সম্মেলনে

(১৯২৬) হিটলার আহ্বান রাখলেন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার। এই সম্মেলনে দলীয় সংগঠনে নিজের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করতে হিটলার স্ট্রেসার ভ্রাতৃদ্বয়ের সমর্থক উত্তর জার্মান শ্রমিক সংগঠনের আনীত প্রস্তাব বাতিল করে স্ট্রেসার ভ্রাতৃদ্বয়কে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। নাৎসি দলের এই মূল উদ্দেশ্যটিকে দেশজুড়ে প্রচার করা শুরু হল। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হল। প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করলেন পল জোসেফ গোয়েবলস। নাৎসি দল হয়ে উঠল নির্বাচিত সরকারের সমান্তরাল প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা। আর্নস্ট রমের নেতৃত্বে গড়ে উঠল দলীয় বাহিনী স্টুর্ম আবটেইলুঙ্গ (Sturm Abteilung) বা SA। হিটলারের দেহরক্ষী বাহিনী হিসাবে গড়ে ওঠা হাইনরিখ হিমলারের নেতৃত্বাধীন শুৎস্‌স্টাফেল (Schutzstaffel) বা SS কালক্রমে SA-র থেকেও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। ১৯২০-র দশকের শেষে এসে নাৎসি দল প্রকৃত অর্থেই ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করল। দলীয় সদস্য সংখ্যা ২৭,০০০ (১৯২৫) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ১,৭৮,০০০ (১৯২৯)। জার্মানির ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল নাৎসি বাহিনী। মার্কিনী ইয়ং পরিকল্পনার (Young Plan) বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে নাৎসিরা সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বেকার শ্রমিক, কৃষি মজুর ও ছোট কৃষক, শিল্পপতি প্রমুখ বিশেষ বিশেষ আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে নাৎসিদের আবেদন তৈরি হল সর্বাধিক। এর ফল লক্ষ করা গেল ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নির্বাচনে। রাইখস্টাগে নাৎসিদের আসন সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হল ১০৭। ১৯৩৩ সালে এই আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮৮। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে সাম্যবাদীদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, আসন সংখ্যার নিরিখে তা ৫৪ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৭৭। তবে ৬৫ লক্ষ ভোটাদাতাদের সমর্থন নিয়ে নাৎসিরা সোসাল ডেমোক্রাটদের পরেই রাইখস্টাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হল।

নাৎসিদের উত্থানের পথ ছিল দ্বিবিধ। আইনী পথে রাইখস্টাগে ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াসের পাশাপাশি দেশজোড়া সন্ত্রাস ও হিংসার মাধ্যমে বেআইনী পথে ক্ষমতারোহন চলছিল। ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে একাধিক জার্মান প্রাদেশিক সরকার নাৎসি Brownshirts বাহিনীর কার্যকলাপে আশঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কাছে আবেদন রাখে। এর মধ্যেই ১৯৩২ সালের বসন্তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হিণ্ডেনবুর্গের (৫৩ শতাংশ ভোট) পিছনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েই খুশি থাকতে হল হিটলারকে (৩৬.৮ শতাংশ)। সাম্যবাদীদের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তার প্রমাণ রইল কমিউনিস্ট প্রার্থী থেলমান কর্তৃক প্রাপ্ত ১০.২ শতাংশ ভোটের মধ্য দিয়ে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার নজির রাখল নাৎসিরা। নির্বাচনের প্রাক্কালে SA বাহিনী সমগ্র বার্লিন শহরকে ঘিরে রইল। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সেনাবাহিনীও এতদিনে নাৎসি মতাদর্শের শরিক হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ছোট ও মাঝারি অফিসারবর্গের মধ্যে তো বটেই, সেনা বাহিনীর বড় অফিসাররাও নাৎসি আদর্শ বিশেষত তার যুদ্ধোন্মাদনার দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। সেনানায়ক এবং রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম কুশীলব ফন শ্লেইকার নাৎসি-বিরোধিতা ত্যাগ করে নাৎসি সমর্থক হয়ে উঠছিলেন। একারণে, যথেষ্ট কারণসহ SA কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও সেই নিষেধাজ্ঞা তোলার উদ্যোগ শক্তিশালী হচ্ছিল। এসময়ে ফন শ্লেইখার, চ্যান্সেলর ফ্রানৎস্‌ ফন পাপের এবং হিটলার জার্মান রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করছিলেন। হিটলারের মদতে ফন পাপেন জার্মান সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু প্রাশিয়ার সোসাল ডেমোক্রাট সরকারের ওপর আঘাত হানেন। প্রশাসনিক স্তরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থার ওপর সরাসরি স্বৈরতন্ত্রী আঘাত এসে পড়ে। সমর্থকদের ওপর হিটলারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারই জেরে প্রশাসনিক যে কোন রদবদলে হিটলারের নির্দেশই ছিল চূড়ান্ত। তারই ইচ্ছায় একসময়ের দলীয় নেতা গুস্তাভ স্ট্রেসার ভাইস ট্যান্সেলর হতে পারেন নি, এমনকি স্ট্রেসারকে দল থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

এসময়ে জার্মানি বিভিন্ন স্থানে নাৎসি বাহিনীর সাথে নাৎসি বিরোধী শক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষ মুখ্য ঘটনা হয়ে ওঠে। ১৯৩২ সালের ১৭ জুলাই এমনই একটি ঘটনা ঘটে উত্তর জার্মানিতে, হামবুর্গ শহরের নিকটে আল্টোনা অঞ্চলে। রাজপথের রণক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও নাৎসিদের তীব্র লড়াই চলে। ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট। চ্যান্সেলর ফন পাপেন এর পরেই রাষ্ট্রপতিকে রাজী করিয়ে প্রাশিয়ার জাতীয় কমিশনার নিযুক্ত হন এবং তার সুযোগ নিয়ে ২০ জুলাই প্রাশিয়ার সরকারকে ভেঙে দেন। দুর্বল শ্রমিক শ্রেণি এজাতীয় অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি, যেমনটি তারা করেছিল ১৯২০ সালে তথাকথিত 'কাপ পুশ'-এর সময়।

আইনী ও বেআইনী পথে যে নাৎসিরা সংগঠিত হচ্ছিল ও নিজেদের অনুকূলে জনমত টেনে আনতে সক্ষম হচ্ছিল তার প্রমাণ মিলল ১৯৩২ সালের জুলাইয়ের নির্বাচনে। ২৩২টি আসন নিয়ে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কমিউনিষ্টদের সংগ্রহে মাত্র ১২টি আসন। পাপেনের পদচ্যুতি অনিবার্য হয়ে গেল, তার স্থলাভিষিক্ত হলেন ফন শ্লেইখার। এই সময়ের পরের কয়েকমাসের ঘটনাক্রম থেকে শ্লেইখার আশা করেছিলেন যে নাৎসিরা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, কারণ নভেম্বরের নির্বাচনে নাৎসিদের সংগ্রহে ছিল ১৯৬টি আসন এবং জুলাইয়ের তুলনায় ২০ লক্ষ ভোট কম পেয়েছিল তারা। তবু নাৎসি দল ভেঙে যায়নি কিছুটা হিটলারের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে এবং কিছুটা নাৎসিবিরোধী সমাজবাদী ও সাম্যবাদীদের জোট না বাঁধতে পারার দরুন। যৌথ প্রয়াসে হয়ত তারা নাৎসি উত্থানকে প্রতিহত করতে পারতেন। তা ঘটল না, বরং রাইখস্টাগে নাৎসিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে ফন শ্লেইখারকেও চ্যান্সেলর পদ থেকে সরে যেতে হল।

জার্মানির রাষ্ট্রজীবনের এই অনিশ্চয়তার কালে জার্মান পুঁজিপতিদের সমর্থনে ও সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থানের সুযোগে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ কর্তৃক ১৯৩৩ সালের ৩০ জনুয়ারি হিটলার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলেন। এর পর দ্রুত দল ও সরকারের হিটলার ও সহযোগীদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমনপীড়ন চলল 'সমন্বয়ে'র (Gleichschaltung) নামে। নানাবিধ আইন করে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হল। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নির্মূল করা হল। নাৎসি গেস্টাপো গুপ্ত পুলিশ বাহিনী, SS, SD (সুরক্ষা বাহিনী) রাষ্ট্ররক্ষার নামে হাজার হাজার নাগরিককে ধরপাকড়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ ও হত্যার মাধ্যমে বিরোধিতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিতে চাইল। সমস্ত 'অনার্য' 'অবিশুদ্ধ' ব্যক্তিদের প্রশাসনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হল। জনৈক এলন্দাজ কমিউনিস্ট মারিনাস ফান ডের লুব কর্তৃক রাইখস্টাগে অগ্নিসংযোগের বিতর্কিত ঘটনার (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) সুযোগে সারা দেশে যে জরুরি অবস্থা জারী করা হল তা চলল তৃতীয় রাইখের অন্তিম দিন পর্যন্ত।

সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন এবং দলীয় সংগঠনে হিটলারের ক্ষমতা অপ্রতিহত করা প্রক্রিয়া থেকে বাদ গেল না SA বাহিনীও। গেস্টাপো ও SS বাহিনীর সহয়তায় SA নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা হল 'দীর্ঘ ছুরিকার রাত্রি' (৩০ জুন-১ জুলাই, ১৯৩৪) নামে পরিচিত রাত্রিতে।

হিটলারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জনের পথে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল ১৯৩৪ সালে। রাট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর ২ আগষ্ট হিটলার রাষ্ট্রপতি হলেন। একাধারে তিনি এখন ফুয়েরার ও রাইখ চ্যান্সেলর। এই ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হিটলার সেনাবাহিনীর পূর্ণ আনুগত্য লাভ করলেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্য লাভের প্রশ্নটি জরুরি ছিল, কেননা আগ্রাসী বিদেশ নীতিকে বাস্তবায়িত করতে সামরিক আগ্রাসন অপরিহার্য ছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন হিটলার। গঠিত হল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কম্যান্ড (OKW)। OKW-র নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হিটলারের হাতে রইল। সেনাবাহিনীতে হিটলারের ক্রিয়াকলাপে অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারদের

পদাবনতি ঘটান হল। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর হওয়ার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতেও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হিটলার তার ইউরোপ জয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আরও কয়েক কদম অগ্রসর হলেন। সুযোগসন্ধানী অথচ সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রয়াস জারি রইল।

৭.৩ ইতালি (১৯১৯-২৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরিণতি জার্মানির মত হয়নি। ইতালি ছিল বিজয়ীর দলে। কিন্তু এর মাধ্যমে ইতালির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি। মূলত দুটি কারণে ইতালি যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমভঙ্গুর অস্ট্রোহাঙ্গোরি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইতালীয় ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হস্তগত করা এবং দেশের অভ্যন্তরে রক্ষণশীল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংহত করে একটি কর্তৃত্বকামী এককেন্দ্রিক শাসনকে শক্তিশালী করা।

যুদ্ধের অবসানে দেখা গেল যে, বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও ইতালির সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটেরক্ষণে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। অন্যদিকে, ইতালীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এই অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রী অরলান্দো ও বিদেশমন্ত্রী সনিনো প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯) ত্যাগ করেন। ক্রমশ প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির বিজয় অসম্পূর্ণ, এমন একটি ধারণা বিস্তার লাভ করে। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনার গতিপ্রকৃতি আশানুরূপ না হওয়ায় এক গভীর হতাশা ও তিক্ততা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধে জয়ী হয়েও ইতালি পরাজিত দেশগুলির ন্যায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে আচ্ছন্ন হয়। এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে বিভিন্ন ধারার—এমনকি পরস্পরবিরোধী—রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তায় ও কর্মে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনগুলি হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। ক্রমশ, ইতালিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জার্মানির মত এখানেও বামপন্থী আন্দোলন দানা না বেঁধে ওঠায় দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ ক্রমশ সংহত হয়। ১৯২০ সালের এপ্রিলে তুরিন শহরের ধাতুশিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বলতর ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী দল ক্ষমতা দখল করে।

৭.৩.১ যুদ্ধোত্তর ইতালি ও সমাজবাদী শাসন

যুদ্ধোত্তর ইাতালিতে তিনটি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মঞ্চে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৯১৯ সালে ইতালির আইনসভার সর্ববৃহৎ তিনটি দল ছিল সমাজবাদী, পোপোলারি বা ক্যাথলিক পপুলার দল এবং উদারপন্থী। প্রধানমন্ত্রী হলেন জিওভানি জিওলিত্তি। সমাজবাদীরা বিচ্ছিন্ন ছিল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় রাখছিল। পোপোলারি'র অভ্যন্তরীণ একতা ছিল না এবং একমাত্র ধর্মীয় প্রশ্নে তারা যাজক-বিরোধী মতবাদ ও আন্দোলনের (anticlericalism) বিরোধিতা করতে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হত। সমাজবাদী ও উদারপন্থী উভয়কেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে চলত পোপোলারি। অন্যদিকে, উদারপন্থীরা অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারের বিরোধিতা করত। উদ্দেশ্য ও লক্ষের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও একটি ক্ষেত্রে এদের প্রকৃতি ছিল অভিন্ন। অনৈক্য ও দায়িত্বপালনে অক্ষমতা যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এই দলগুলির কোনটিকেই শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেনি। কোন প্রকার সংহত, দীর্ঘস্থায়ী ও সদর্থক কর্মসূচীর অভাব জনগণের কাছে এদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

ইতালি তৎকালীন আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যুদ্ধে যোগদানের ফলে ইতালির আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার জন্য ইতালির ব্যয় হয়েছিল ১৮৬১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ। মিত্রপক্ষের আর্থিক সহায়তা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় ৫০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় পাঁচগুণ। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ ছিল অনেক কম। যুদ্ধ চলাকালীন কৃষকদের ভূমিসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। শিল্প শ্রমিকদের সুবিধার্থেও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারি ব্যর্থতা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানের জন্ম দিল। আর্থিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় কারখানা লক-আউট হয়ে উঠল শ্রমিক জীবনের অঙ্গ। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বড় বড় জোত দখলের মধ্যে সম্পত্তিবান শ্রেণী বলশেভিক মতবাদের ছায়া দেখতে পেল। অন্যদিকে, যুদ্ধের পরে কর্মহীন হয়ে পড়া সেনাবাহিনী লুঠতরাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। এই পরিস্থিতিতে ধনী ভূম্যধিকারী ও শিল্পপতিরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক কোন শক্তির আগমনের অপেক্ষায় রইল।

৭.৩.২ ফ্যাসিবাদের উত্থান

ফ্যাসিবাদ কথাটির উৎপত্তি প্রাচীন লাতিন শব্দ fascis থেকে, যার অর্থ শাসকের দণ্ডগুচ্ছ। কর্তৃত্বের এই প্রতীকটিকে ১৯২০-র দশকে ইতালিতে দক্ষিপন্থীরা আত্মপরিচিতি গঠনে কাজে লাগিয়েছিল। ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের নেপথ্যে ছিল তদানীন্তন ইতালির রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদানের বিষয়ে রাজনৈতিক মহল দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যুদ্ধের পরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ ছিল। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিল দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালির যোগদানের সমর্থক (Pro-interventionist) জাতীয়দাবাদীরা আশা করেছিল যুদ্ধোত্তর পর্বেও ইতালির আগ্রাসী ভূমিকা বজায় থাকবে। বিশেষত, আড্রিয়াটিক তীরবর্তী জালমাশিয়া তথা ফিউম অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য বজায় থাকবে। ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান অঞ্চলে ইতালির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদাতৎপর ছিল জাতীয়তাবাদীরা। এজন্য আড্রিয়াটিক সাগরের তটবরাবর যুগোশ্লাভিয়া গঠনকে তারা ইতালির সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখতে শুরু করল। ক্রমশ এই মতবাদকে তারা সফলভাবে ইতালির জনতার সম্মুখে উপস্থাপিত করে তুলতে পেরেছিল। সমাজবাদী, পোপোলারি ও উদারবাদীরা আগেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। বিকল্প হিসাবে উঠে আসে জাতীয়তাবাদীরা, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক প্রাক্তন সমাজবাদী বেনিতো মুসোলিনি। ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ মিলান শহরে, যা একদা শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল, গঠিত হয় ফ্যাসিবাদি দল। সেনাবাহিনীর এলিট গোষ্ঠী আরদিতি (arditi) প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি ছিল মুসোলিনির সহযোগী, সমর্থক। মহাযুদ্ধোত্তর বাঁটোয়ারার অঙ্গ হিসাবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের ভাঙনেই এরা খুশী ছিল না। আড্রিয়াটিকের অপর পাড়ে যুগোশ্লাভিয়া ও আলবানিয়াতে ইতালীয় উপনিবেশ গড়ে তোলা ছিল জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য। এজন্য ১২ নভেম্বর ১৯২০ সালে স্বাক্ষরিত রাপালো চুক্তিতে ঐ অঞ্চলগুলি থেকে ইতালির পশ্চাদপসরণকে জাতীয়তাবাদীরা সমাজবাদী সরকারের কাপুরুষতা বলে মনে করেছিল।

প্রথমাবধি ফ্যাসিবাদীরা ছিল সমাজবাদের প্রতিপক্ষ। এজন্য খুব দ্রুত এরা সম্পত্তিবান শ্রেণীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাহিনী স্কোয়াদ্রে ((Squadristi/squadre) কার্যত ধনিক শ্রেণীর রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে। ধর্মঘটী শ্রমিক ও বিদ্রোহী কৃষককে দমনের ভূমিকায় এদের অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, আপন ক্ষমতা অর্জনের জন্য মুসোলিনির প্রয়োজন ছিল সম্পত্তিবান শ্রেণীর আর্থিক সহায়তা। এই অভীষ্ট পূরণে প্রয়োজনমত

মতাদর্শ বদল করে চলা ছিল মুসোলিনির কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য। ক্যাথলিক চার্চও মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাহিনীর মধ্যে সমাজবাদকে প্রতিহত করার যোগ্যতম প্রতিভূকে খঁজে পেয়েছিল। এই কারণে ক্যাথলিক চার্চ পোপোলারি'র বদলে পুরোপুরিভাবে ফ্যাসিবাদের সমর্থক হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিহাস হল, যে মুসোলিনি একদা ঘোষিতভাবে রাজতন্ত্র, চার্চ ও পুঁজির বিরোধী ছিলেন তিনিই ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠলেন এগুলির সবচেয়ে বড় সমর্থক ও আশা-ভরসার কেন্দ্র।

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পথ হয়ত সহজ হত না, যদি না তদানীন্তন উদারপন্থী শিবির দুর্বল হয়ে পড়ত। প্রধানমন্ত্রী জিওভানি জিওলিত্তি'র উদারপন্থী সরকার ১৯২০-২১ সালের শ্রমিক অসন্তোষ ও কৃষক বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারে নি। বরং দেশের শান্তি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের দাবী তুলেই এই সুযোগে মুসোলিনি জনমানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২১ সালের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ফ্যাসিস্ত 'কালো কুর্তা' দলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। অন্যদিকে, ইতালিতে ফ্যাসি-বিরোধীদের সংখ্যাও কম ছিল না। ফ্যাসিবাহিনীর সশস্ত্র হামলা এবং জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখা সত্ত্বেও ১৯২১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী জিওলিও ফাসিবাদীদের দেশের উন্নয়নে যুক্ত করতে চেয়ে কার্যত তাদেরই হাত শক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে উত্থানের পথ প্রশস্ত করেন। এই নির্বাচনে মুসোলিনি সহ ৩৫ জন ফ্যাসিবাদী সরকার-সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন। এই ঘটনা ঘটছিল তখন, যখন স্কোয়াদ্রিস্তি নানা শহরে বলপূর্বক সমাজবাদী সরকারকে উৎখাত করছিল। 'বলশেভিক বিপদে'র কথা বলে এই উৎখাত চলে, যদিও ১৯২২ সালের ইতালিতে কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

১৯২২ সালে রোম অইভযানের মধ্য দিয়ে মুসোলিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। যদিও এই অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে প্রথমদিকে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন না। সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রতিবাদের শেষ স্বরটুকু স্তব্ধ করে দেওয়া তাঁর প্রয়োজন ছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্র, উদারপন্থার লেশমাত্র তার কাছে অনাকাঙিত ছিল। ক্ষমতা দখলের আট বছর পর Doctrine of Fascism গ্রন্থে (১৯৩০) মুসোলিনি লিখেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদ চিরস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা বা উপযোগিতায় বিশ্বাস করে না। ..... যুদ্ধই একমাত্র মানুষের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে ..... ফ্যাসিবাদের আক্রমণের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং [ফ্যাসিবাদ] এর (গণতন্ত্রের) ধ্যানধারণা ও বাস্তব কার্যকারিতা ও পদ্ধতি উভয়কেই বর্জন করে।'

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জঠরেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। আবার, তাকেই ধ্বংস করে শক্তিশালী কেন্দ্রীরভূত সাম্রাজ্য নির্মাণ এর লক্ষ্য। Doctrine of Fascism গ্রন্থের অন্যত্র মূসোলিনি লিখেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদ . একমাত্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে। ফ্যাসিস্ত ধারণায় রাষ্ট্র সর্বব্যাপী, যার বাইরে কোন মানবিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকতে পারে না ..... এই অর্থে ফ্যাসিবাদ টোটালিটারিয়ান .....।'

টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ১৯২২ সালের ২৭ অক্টোবর মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাহিনীর 'রোম অভিযানের'র ফলস্বরূপ ২৯ অক্টোবর রাজা তৃতীয় ভিক্তর ইমানুয়েলের দ্বারা মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন। ইতালির অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের একটি পর্ব সমাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও ইতালিতে ফ্যাসিবাদে-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার অবসান ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে আমলাতন্ত্র, সেনেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ ফ্যাসিবাদী মতবাদ ও সমর্থক দ্বারা পূর্ণ করার প্রক্রিয়া জারী থাকা সত্ত্বেও ১৯২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফাসিস্ত নয় এমন দলগুলি সাত কোটির মধ্যে তিন কোটি নির্বাচকের সমর্থন লাভ করেছিল। এই নির্বাচন সংঘটিত হয়েছিল এমন সময়ে যখন ইতিমধ্যেই স্কোয়াদ্রিস্তি রাষ্ট্রের বেতনভোগী জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং ফ্যাসিবাদের সমালোচকরা রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের

শিকার। সংবাদপত্রের উপর কঠোর সেন্সরশিপ চালু করা, গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর (OVRA) প্রতিষ্ঠা ইতালিকে যথার্থই একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছে। জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছানো হয়েছে 'মুসোলিনি সর্বদা সঠিক' (Mussolini ha sampre ragione)। তিনিই জনতার নেতা (IL Duce) এবং সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানকারী। প্রধানমন্ত্রী রূপে অভিষেকের পর একাদিক্রমে একুশ বছর মুসোলিনি ছিলেন ইতালির সর্বেসর্বা। দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট বাছাই পদ্ধতিতে প্রশাসনকে ফাসিস্ত করে তোলা এবং ইউরোপের সামনে আগ্রাসী ভূমিকা রাখাই ছিল এই সময়ের ইতালীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ১৯২৫ সালে স্বল্পকালের জন্য গ্রীসের কর্ফু দ্বীপ দখল বা তার পরের বছর ভূমধ্যসাগরকে 'নিজস্ব সমুদ্র' (Mare Nostrum) হিসাবে বর্ণনা মুসোলিনি তথা ফাসিস্ত দলের আগ্রাসী ভূমিকা বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব ইউরোপে বিভেদমূলক কূটদৌত্য এই ভূমিকাকে আরও জোরদার করেছিল। তাসত্ত্বেও ইউরোপে বহু প্রতিশ্রুত 'যৌথ নিরাপত্তা' তেমন বিঘ্নিত হয়নি, যদিও তার আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। বরং, ১৯২৪ সালের ইতালি-যুগোশ্লাভিয়া শান্তি চুক্তি সাময়িকভাবে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করেছিল।

১৯২০-র দশকের মধ্যভাগে ইতালি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময় থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। দেশের অভ্যন্তরে ইতালির প্রথাগত মতৈক্যভিত্তিক সরকারের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীভূত একনায়কতন্ত্র। সমাজবাদী, উদারবাদী পরীক্ষা নিরীক্ষর স্থান দখল করেছে উগ্রজাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থা। শ্রমিক আন্দোলনের উপর জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, পরিবর্তে এসেছে তথাকথিত কর্পোরেট সংস্কৃতি। শ্রমিক-কৃষকের সমস্যা সমাধানের বদলে দলীয় কর্মীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সর্বাধিক সুফল লাভ করেছে শিল্পপতি ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী। ১৯১৮ সালের তুলনায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের উন্নতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। অন্যদিকে, ইতালির পশ্চাদপদ দক্ষিণাঞ্চল অবহেলিত রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরবর্তী আরও প্রায় দেড় দশক ইতালি কোন বৃহৎ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, বা আগ্রাসনের শিকার হয়নি। বরং, ভুমধ্যসাগরকে একটি ইতালীয় হ্রদে পরিণত করার বাসনা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যথেষ্ট ভীতির জন্ম দিয়েছিল। 'সমগ্র ইতালি আবর্তিত হচ্ছে রোমকে ঘিরে এবং রোম আবর্তিত হচ্ছে সর্বাধিনায়ককে (মুসোলিনি) ঘিরে, এই জাতীয় ফ্যাসিস্ত ধারণা স্থান করে নিচ্ছিল ইতালির নাগরিক সংস্কৃতিতে। এই পরিবেশে আরও জোরালো আঘাত এল উনিশশো ত্রিশের দশকে যখন ইতালির ভবিষ্যৎ মিত্র নাৎসি জার্মানি'র হাতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতিসমস্যা এবং লিগ অফ নেশনসের প্রাসঙ্গিকতা বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হল। ততদিনে মুসোলিনি ও তার ফ্যাসিস্ত দল ইতালির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে।

৭.৪ সারাংশ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে গঠিত হয়েছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্র। প্রজাতান্ত্রিক শাসন চলে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধোত্তর জার্মানি পরাজিত পক্ষ হিসাবে তীব্র আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটে আচ্ছন্ন ছিল। প্রজাতান্ত্রিক জার্মানি সাংবিধানিক পথে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, অভ্যুত্থানের প্রয়াস এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ও বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে এককভাবে দায়ী করে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলো যে চাপ সৃষ্টি করে তার ভারবহন করার ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতার প্রয়োজন ছিল ভাইমার প্রজাতন্ত্র তা প্রদর্শন করতে পারেনি। যদিও এই সময়েই, বিশেষত ১৯২৩-২৯ সময়কালে জার্মানিতে জীবনযাত্রার মান কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়বাদ ক্রমাগত জোরদার হয়। জাতিবিদ্বেষী, সাম্যবাদ বিরোধী ও কঠোর

একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সমর্থক নাৎসি দল অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে নির্বাচনী সোপান বেয়েই ক্ষমতা দখল করে। ১৯৩০-দশক ধরেই বিরোধী দল, ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নাৎসি একাধিপত্য কায়েম করা হয়। দলীয় সংগঠনের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয় হিটলারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় রাইখের শাসন। ক্রমশ তা জার্মানিকে এগিয়ে নিয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে।

ইতালি প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ হলেও পরাজিত দেশগুলোর তুলনায় তার অবস্থা বিশেষ উন্নততর ছিল না। যুদ্ধোত্তর সমাজবাদী শাসন ক্রমাগত অন্তর্কলহ, অযোগ্যতার কারণে জনগণের মনে হতাশার জন্ম দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালিতে কোন কোন গোষ্ঠী, ব্যক্তি সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণের জন্য ক্রমাগত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভূমধ্যসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর সন্নিহিত এলাকার সম্প্রসারণমূলক কাজ কর্ম লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলে ফ্যাসিবাদীরা বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বে রোম অভিযান করে। মুসোলিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। তিনিই ইতালির সর্বাধিকনায়ক এবং টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের প্রধান কারিগর। আগ্রাসী বিদেশনীতি এই সময়ের ইতালির রাষ্ট্রজীবনের বৈশিষ্ট্য। দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাহিনীর সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষ, সংবাদপত্র ও জণগণকে সন্ত্রস্ত করা হতে থাকে। আবার জনতার একাংশ ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী শাসনের সমর্থক হয়ে ওঠে। ১৯২০-র দশকের মধ্য-ভাগের ইতালিতে স্থাপিত হয়ে গেল ফ্যাসিবাদী শাসন, যা চলল পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে।

৭.৫ অনুশীলনী

(পাঠ্যাংশটি ভালোভাবে পড়ে নিয়ে উত্তর দিন। প্রয়োজনে 'পরিশিষ্ট' অংশটি দেখুন।)

জার্মানি

১. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে দিন।

(ক) প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হিসাবে জার্মানিতে কোন ধরণের ধারণার প্রচলন ঘটেছিল?

(খ) 'কাপ পুশ্' (Kapp Putsch) বলতে আপনি কী বোঝাবেন?

(গ) ১৯২০-রে দশকের জার্মানিতে কোন ধরণের মানসিকতার বিস্তার ঘটছিল? একে কি আপনি পশ্চৎপদ বলবেন?

(ঘ) কোন কালপর্বটিকে আপনি জার্মান প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে সফল অধ্যায় বলবেন এবং কেন?

(ঙ) নাৎসি বলতে কাদের বোঝায়? এদের উত্থানের প্রাথমিক পর্যায় কী ছিল উল্লেখ করুন।

(চ) হিটলারের ক্ষমতারোহনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সহায়ক ব্যক্তি/সংগঠন/কারা ছিলেন/কোনগুলো ছিল?

(ছ) নাৎসি প্রশাসনে 'সমন্বয়' বলতে কী বোঝান হয়?

২. আড়াইশো শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

(ক) ১৯১৯-২৯ কালপর্বের জার্মান প্রজাতন্ত্রের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

(খ) হিটলারের ক্ষমতা দখলের বিভিন্ন পর্যায়গুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

ইতালি

১. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে দিন।

(ক) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কী ছিল?

(খ) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

(গ) ফ্যাসিবাদী কারা? যুদ্ধের পর তারা কী আশা করেছিল?

(ঘ) ফ্যাসিবাদের মূল আর্দশগুলো লিখুন।

(ঙ) টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মুসোলিনির গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কী কী ছিল?

২. দেড়শো শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

(ক) ফ্যাসিবাদী উত্থানের পদ্দতি কী কী ছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই এককের অন্যত্র কোথাও কী এর সঙ্গে তুলনীয় ঘটনার উল্লেখ পেয়েছেন?

(খ) মুসোলিনির ক্ষমতারোহনের পর ইতালির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আসে?

একক ৮ ❑ জাপানের আগ্রাসন — মাঞ্চুরিয়া সংকট — আবিসিনিয় যুদ্ধ — স্পেনের গৃহযুদ্ধ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ সাম্রাজ্যবাদী জাপান ও মাঞ্চুরিযা সংকট

৮.২.১ জাপানের আগ্রাসন

৮.২.২ মাঞ্চুরিয়া সংকট

৮.২.৩ জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা

৮.৩ অবিসিনিয়া যুদ্ধ (১৯৩৫)

৮.৪ স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)

৮.৫ রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ

৮.৬ তোষণ নীতি

৮.৬.১ ব্রিটেনের তোষণ নীতি

৮.৬.২ তোষণ নীতি ও ফ্রান্স

৮.৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

৮.৮ জার্মান বিদেশ নীতি (১৯৩৩-৩৯) ইতিহাস বিদ্যার নানা ধারা,

৮.৯ সারাংশ

৮.১০ অনুশীলনী

৮.১১.১ পরিশিষ্ট ১ : জার্মান, ইতালি ও জাপানের রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ (১৯১৯-৪১)

৮.১১.২ পরিশিষ্ট ২ : শব্দার্থ

৮.১১.৩ পরিশিষ্ট ৩ : সময়পঞ্জি

৮.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :

- প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাপানের আগ্রহের কারণ।
- জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিস্তার এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ ও উগ্র দেশপ্রেমের টানাপোড়েন।
- মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথে অন্তর্ঘাত এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সামরিক আগ্রাসন ও তার ফলাফল।
- মাঞ্চুরিয়া সংকটে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা।

- ইতালির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ এবং আবিসিনিয়াতে ইতালির ভূমিকা।
- ইতালির সামরিক আগ্রাসন ও আবিসিনিয়া যুদ্ধ।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়।
- রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ এবং তার প্রভাবে পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনীতি।
- ইউরোপীয় তোষণ নীতিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ইউরোপ এবং জার্মানির গ্রাসন।
- জার্মান বিদেশনীতির বিবর্তন প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদদের মতামত।

৮.১ প্রস্তাবনা

এই এককের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল, উনিশশো ত্রিশের দশকে পূর্ব এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ইতিহাস। উনিশ শতকের চতুর্থ ভাগে এই অঞ্চলগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। বিংশ শতকে সেই প্রয়াস বজায় থাকে। অন্যদিকে, ইউরোপে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শক্তির লড়াই ছিল সমকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। ইউরোপে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদ যখন শক্তিশালী হচ্ছিল তখন অন্যান্য পশ্চিমী গণতন্ত্রী দেশগুলির দ্বিধাচিত্ততা ও ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রতি তোষণমুখী মনোভাব ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক সংকটের জন্ম দিয়েছিল। এই সংকটের কালে সমাজ ও অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদী টানাপোড়েন জন্ম নেওয়া অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপ। সেই প্রসঙ্গও এই এককে আলোচিত হবে। এসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল জার্মান বিদেশনীতির বিবর্তন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসবিদদের বিভিন্ন মতামত এই এককের শেষভাগে আলোচিত হবে।

৮.২ সাম্রাজ্যবাদী জাপান ও মাঞ্চুরিয়া সংকট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জাপানের অবস্থা ছিল ইউরোপে ইতালি ও জার্মানির সাথে তুলনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়নি। তবে বিজয়ী অন্য শক্তিগুলির সাথে তার সম্পর্ক ক্রমশই সংঘাতপূর্ণ পথে চালিত হচ্ছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এবং ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২) জাপান খুশী হয়নি। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী এই দ্বীপরাষ্ট্রটি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে চীনে তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে। জাপানের এই আকাঙ্খা তাকে পশ্চিমী শক্তি বিশেষত ব্রিটেনের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। বিশেষত চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করা ছিল জাপানের অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ফলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জার্মানির হাতছাড়া হওয়া সাবেক উপনিবেশগুলিও জাপান করায়ত্ত করতে চায়। তার এই প্রচেষ্টাতে ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েরই বিরোধিতা ছিল। উপরন্তু, ১৯২৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসে যে অভিবাসন আইন পাশ হয়, তা জাপানের মনে আশঙ্কা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল। পশ্চিমী শক্তি সমূহের কাছে ব্রাত্য হয়ে যাওয়ার ভাবনায় জাপানের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিতে বিশেষত সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান অথবা ইঙ্গ-মার্কিন, কোন শক্তির প্রাধান্য থাকবে তা হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রথম মহাযুদ্ধে জাপানের জয় জাপানবাসীদের বিশেষ আশ্বস্ত করতে পারেনি। জাপানি জনগণের সম্মুখে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি সফলভাবে প্রচার করতে পেরেছিল যে পশ্চিমী বিশ্বের কাছে জাপান একঘরে হয়ে গেছে। অধিকতর জাতীয়তাবাদী প্রাবল্যে যে দ্বিগুণ জাতীয়তাবাদের (Double Patriotism) প্রচার ও প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জাপানি নাগরিককে আগ্রাসী বিদেশনীতির সমর্থক করে তোলা। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, মার্কিন অভিবাসন নীতিতে জাপানের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাপান-আমেরিকা সম্পর্কের অবনতি, এ সবই জাপানি উগ্রজাতীয়তাকে পুষ্ট করেছিল। মহা-মন্দার কালে আমেরিকায় জাপানি পণ্য বয়কটের ঘটনা কিংবা ১৯৩০ সালের হিলস্মুট শুল্ক (Hawley-Smoot Traiff) জাপানি পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। একইভাবে, ব্রিটেনও ভারত বা আফ্রিকায় তার উপনিবেশগুলিতে জাপানি বস্ত্রের আমদানীকে রদ করার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, বিবিধ প্রকার সরকারি উৎসাহ সত্ত্বেও জাপানের ফুলে ফেঁপে ওঠা জনসমষ্টির খুব ক্ষুদ্র অংশই এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বসবাস করতে প্রণোদিত হয়েছিল। ১৯২০-র দশকের মধ্যভাগে মাঞ্চুরিয়ায় বাসা বাঁধা জাপানির সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। সাবেক জার্মান উপনিবেশ শানতুং বা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকেও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অনুরোধে উপরোধ জাপানকে সরে আসতে হয়। এই সব ঘটনা জাপানে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। এই বিচ্ছিন্নতাই কালক্রমে উগ্র জাপ জাতীয়তাবাদের ভিত শক্ত করে। ১৯২০-র দশকের শেষে এসে দেখা গেল যে, জাপানের রাজনৈতিক পটচিত্রে বিদেশমন্ত্রী বিদেহারা'র আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে মিশে রয়েছে সেনাবাহিনীর জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। ক্রমে দ্বিতীয়টিই জোরদার হল। সেনাবাহিনীর একাংশ ভীত ছিল এই ভেবে যে, শিদেহারার বিদেশনীতি কার্যত চীনের হাত শক্ত করবে এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবে। বহুমাত্রিক জাপানি জাতীয়তাবাদের এই প্রেক্ষাপটে এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপ সম্প্রসারণ নীতিকে বিবেচনা করা যেতে পারে, যার ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি সামরিক আগ্রাসনের সূত্রপাত হল।

৮.২.১ জাপানের আগ্রাসন

মাঞ্চুরিয়াকে নিয়ে জাপানি আগ্রহের একটি পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯০৪-০৫ সালের যুদ্ধে জয়লাভের পর জামান মাঞ্চুরিয়ায় ১৫,০০০ সৈন্য রাখার অধিকার লাভ করেছিল। এই সৈন্য নিযুক্ত ছিল দক্ষিণ মাঞ্চু রিয়ায় রেলপথের সুরক্ষায়, মুকদেন শহর ছিল এদের প্রধান ঘাঁটি। ১৯১১ সালে চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাঞ্চু রাজবংশের শাসন সমাপ্ত হলেও আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুদের পারস্পরিক সংঘাত চীনের বিস্তীর্ণ এলাকাকে অশান্ত করে রেখেছিল মাঞ্চুরিয়া তার বাইরে ছিল না। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে চীনে চিয়াং কাই-শেক ও তার কুয়োমিনতাং (জাতীয়তাবাদী) দলের ক্রমোন্নতি ও পরিশেষে ১৯২৮ সালে পিকিং দখল জাপানি জাতীয়তাবাদীরা মেনে নিতে পারেনি। জাপানি পরিবার-ভিত্তিক পুঁজিনির্ভর বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা জাইবাৎসু ও অন্যান্য শিল্পোদ্যোগীদের কাছে মাঞ্চুরিয়াকে চীনা কবল থেকে মুক্ত করে জাপানের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। চীন ও মাঞ্চুরিয়াকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মাঞ্চুরিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বাসনা আরও উদগ্র হয়ে উঠল।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের জোরাল আভাস মিলল ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে। সেইয়ুকাই দলের নেতা তানাকা গিইচি একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও বিদেমন্ত্রী থাকার সুবাদে ঘোষিতভাবে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করলেন। সেনাবাহিনীর পূর্ণ সমর্থনও ছিল তার পিছনে। পূর্বতন বিদেশমন্ত্রী শিদেহারা কিজুরো আন্তর্জাতিকতার নীতিতে

আস্থাশীল থেকে আপোসমুখী শান্তিকামী বিদেশনীতি প্রণয়ন করেছিলেন তানাকা'র বিদেশনীতি প্রাথমিকভাবে তার বিরোধী ছিল। তৎকালীন যুগের এক চাঞ্চল্যকর দলিল তথাকথিত 'তানাকা স্মারকে' বলা হল য়ে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া দখল করেই চীনে জাপানি স্বার্থ বজায় রাখতে হবে। পরবর্তী কালে মার্কিনী শক্তিকে পরাস্ত করে চীন বিজয়ের পথে জাপান অগ্রসর হবে। চীনই হবে ভবিষ্যতে জাপানের বিশ্বজয়ের সোপান।

তবে বাস্তবে এতখানি আগ্রাসী ভূমিকা রাখা জাপানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হত, এবং সেই অনুযায়ী বিদেশনীতিতে রদবদল ঘটাতে হত। চীনে কুয়োমিনতাঙের শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত জাপান শানতুংয়ে সেনা পাঠালে তার ফল হয় দ্বিবিধ। চীনে জাপানি দ্রব্যের বয়কট শুরু হয় ও কুয়োমিনতাং ও তার রাজনৈতিক বিরোধীরা পরস্পরের নিকটে চলে আসে। অন্যদিকে জাপ সৈন্যের অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবাদ করে ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় অবধারিতভাবে এক্ষেত্রে জাপানকে আপোস করতে হল। মাঞ্চুরিয়া ও শানতুংয়ে জাপানি স্বার্থরক্ষার বিনিময়ে চীনের অন্যত্র কুয়োমিঙতাঙের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া তানাকা'র উপায় ছিল না। কারণ এর বিকল্প ছিল সম্মুখ সমরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মহড়া নেওয়া। তানাকা'র বিদেশনীতি কার্যত পূর্বসূরী শিদেহারা'র আপোসমুখী শান্তির ধারাতেই প্রবাহিত হল। তানাকা পদচ্যুত হলেন ১৯২৮ সালের শেষ দিকে। সামরিক বাহিনীর চীন-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অসাফল্য তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। অধ্যাপক ইয়ান নিশের ভাষায়, "বিপর্যয়করভাবে, চীনের মূল অঞ্চল থেকে মাঞ্চুরিয়াকে পৃথক করার জন্য তানাকা'র প্রয়াস ..... সেই মুহূর্তের জন্য ব্যর্থ হল।"

তানাকা'র পতনের পর নতুন প্রধান মন্ত্রী হামাগুচি ওসাচি'র নেতৃত্বে নতুন মিনসেইতো সরকারে শিদেহারা'র বিদেশমন্ত্রী রূপে প্রত্যাবর্তন ঘটল। চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে এক প্রকার মধ্যস্ততায় আসার চেষ্টা হল। এ অবস্থা উগ্রজাতীয়তাবাদী ও সেনাবাহিনীর পছন্দসই ছিল না। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, যে সরকার বা ব্যক্তিই ক্ষমতায় আসুক না কেন উগ্রজাতীয়তাবাদীরা ও সেনাবাহিনী সমগ্র দশক জুড়ে লাগাতার আগ্রাসী রাষ্ট্রীয় নীতিকে কার্যকর করার স্বপক্ষে রায় দিয়েছে। এই 'hawkish' মনোভাবই হয়ত একদিন জাপানকে পুনরায় যুদ্ধের পথে ঠেলে দেবে।*

১৯২১-২২ সালের ওয়াশিংটন সম্মেলন বা ১৯৩০ সালের লন্ডনে নৌ-সম্মেলনে জাপান খুশি হয়নি। তার নৌবাহিনীর ক্ষমতাকে ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় সত্তর শতাংশ বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাসত্ত্বেও লন্ডন নৌ-চুক্তিকে জাপানি সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে অসন্তোষ চেপে রাখা যায়নি। আততায়ীর হাতে প্রধানমন্ত্রী হামাগুচি'র মৃত্যু তার প্রমাণ। হত্যাকারীকে জাপানি সংবাদ মাধ্যমে বীর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে শিদেহারার বিদেশনীতি ছিল তাদের রোষের শিকার।

আন্তর্জাতিকতাবোধের ওপর ভিত্তি করে শিদেহারা'র বিদেশনীতি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ওকাৎসুকি রেইজুরো'র সময়েও বজায় থাকে। শিদেহারার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তবসম্মত এবং বিভিন্ন দেশের সহাবস্থানের প্রশ্নটিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি চীন-জাপান দ্বন্দ্বের সমাধানসূত্র খুঁজছিলেন। মাঞ্চুরিয়াকে নিয়ে কোন একতরফা বা দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত তিনি চাননি। তিনি চাইছিলেন বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যস্থতায় জাপানের সমস্যাগুলির সমাধান। দ্বিপাক্ষিক না হয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়েই পূর্ব এশিয়ায় শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের আকাঙ্খায় জাপানি বিদেশনীতি সে সময়ে পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৩১ সালের এক বক্তৃতায় শিদেহারা এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার ভূমিকার ওপর জোর দেন। একদিকে যেমন উনিশ শতক থেকেই

*Ian Nish, Japanese Foreign Policy 1869-1942, London, 1977,pp. 162-63.

চীনদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Extra-territorial Rights) ভোগ করত এবং চীনের ওপর বৈষম্যমূলক চুক্তি (Unequal Treaties) চাপিয়ে দিয়েছিল, তার অবসান ঘটানোর কথা বলা হচ্ছিল; পাশাপাশি 'দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায়, বিশেষত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেল-পথের ক্ষেত্রে জাপানি অধিকারের একপ্রকার স্বীকৃতি দাবী করা হচ্ছিল।

তবে বাস্তবত এই আশাবাদ প্রতিহত হচ্ছিল জাপানি সম্পত্তির ওপর চীনা হামলার কারণে। বরং জাপানি সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমেই প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেই জাপানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উনিশশো তিরিশের দশকের গোড়ায় এধরণের জঙ্গি উদ্দীপনা জাপানি সেনা বাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। জাপানি সেনাবাহিনীর এই উদ্দীপ্ত অংশটিই গড়ে তোলে সাকুরাকাই সংগঠন (Cherry Blossom Society)। মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে জাপানি শাসনের আওতায় আনা ছিল এদের উদ্দেশ্য। তৎকালীন জাপানের অর্থনৈতিক মন্দা সমাজে যে প্রভাব রেখেছিল তারই ফলে জাপানে, বিশেষত সেনাবাহিনীতে, সমাজবাদ ও উদারপন্থা উভয়েরই বিরোধী চরম আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী প্রভাব-মুক্ত জাপান গঠনের আর্দশ লক্ষ্য করা যায়। হতাশ, প্রতিক্রিয়াধর্মী সাকুরাকাই ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরেও ক্রমাগত সরকারি নীতিবদলের জন্য চাপ দিতে থাকে। এই নীতিবদলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল সরাসরি মাঞ্চুরিয়া অভিযান। উগ্র জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক ওকাওয়া শুমেই ১৯৩০ সালের শরৎকালে দেশব্যাপী বক্তৃতামালায় বারংবার মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি অধিকার স্থাপনের কথা বলেন। তার অভিমত ছিল, অনুন্নত মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি কৃষকদের বসবাস শুরু করা উচিত। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমনভাবে পূর্ব চীনা রেলপথের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দৃঢ়তা ও তৎপরতার পরিচয় দেয়, জাপানেরও সেই পথ অনুসরণ করা উচিত বলে তার প্রচারে জোর দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণ হল ওকাওয়া'র এই প্রচারের পৃষ্ঠপোষক ছিল জাপানের যুদ্ধমন্ত্রক। উগ্রজাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক, সেনাবাহিনীর অফিসারবর্গ, যুদ্ধমন্ত্রক প্রমুখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমন্বয় এ সময় লক্ষ্য করা যায়।

৮.২.২ মাঞ্চুরিয়া সংকট

তাৎক্ষণিকভাবে যে ঘটনার মধ্য দিয়ে জাপানের মাঞ্চুরিয়ায় আগ্রাসনের সূত্রপাত ঘটে, তা ঘটেছিল ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাপানের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, ১৮-১৯ সেপ্টেম্বরের রাত্রে মুকদেনের সন্নিকটে একটি জাপানি পাহারাদার বাহিনী কিছু সংখ্যক চীনা সৈনিককে রেলপথে নাশকতামূলক কাজ করতে দেখতে পায় এবং তাতে বাধাদান করে। এর ফলস্বরূপ মুকদেনে অবস্থানকারী ১০,০০০ চীনা সৈন্যকে নিরস্ত্র করে ফেলা হয়। পরবর্তী চারদিনে মুকদেনের ২০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত চীনা শহর জাপানিদের হাতে চলে আসে। এই শহরগুলির কোন কোনটি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। মাঞ্চুরিয়াতে চীন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করা হয় এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে উত্তর মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে জাপানিদের হস্তগত হয়। উত্তরাংশ দখলের পর আগ্রাসী বাহিনী দক্ষিণাভিমুখী হয়। দখলের এই পর্যায়ে বোমাবর্ষণকারী বিমান ব্যবহৃত হয়। ২৮ ডিসেম্বর চিন্‌চাও এবং ৪ জানুয়ারী, ১৯৩২ সালে শানহাইকাওয়ান হস্তগত হয়। মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী শানহাইকাওয়ান দখলের মধ্যে দিয়ে জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল সম্পূর্ণ হয়।

১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের রাত ১০টা নাগাদ সংঘটিত ঘটনাটিতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় বাস্তবত তার গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কম ছিল। রেলপথে বিধ্বস্ত করা হয় নি, বরং রেল চলাচলের পক্ষে ক্ষতি খুবই সামান্য হয়েছিল। জনৈক জাপানি রেলকর্মীকে কাজটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে সুদূরপ্রসারী অর্থে

এর অভিঘাত হয়েছিল যথেষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে স্তূপীকৃত বারুদে অগ্নি সংযোগ করেছিল ঘটনাটি। মাত্র চার মাসের মধ্যে জাপানী সেনাবাহিনী যেভাবে মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল তাতে বলা যায় যে, আক্রমণের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী ওয়াকাৎসুকি বা বিদেসমন্ত্রী শিদেহারা কারও পক্ষে সৈন্যবাহিনীকে চাইলেও প্রশমন করার উপায় ছিল না। এবং তারা তা চানও নি।

মাঞ্চুরিয়া দখলের ঘটনা জাপানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। এর অভিঘাতে মিনসেইতো সরকার এবং শিদেহারা'র বিদেশনীতি উভয়েরই অবসান ঘটে। তবে মাঞ্চুরিয়া দখল করেই জাপানি সেনাবাহিনী থেমে থাকেনি। চীনের অভ্যন্তরে সাংহাই শহরে জাপ বাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ চালায়, চীনা বাহিনী পিছু হটে। ছয় সপ্তাহ পরে উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আপাতভাবে এই সংকটের অবসান ঘটে।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জার্তিক ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবর্তন সূচিত করল। এশিয়ায় চীন জাপানি আক্রমণের সামনে উন্মুক্ত হল, এবং মাঞ্চুরিয়াকে কার্যত উপনিবেশে পরিণত করার মধ্য দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় জাপান নিজের সদম্ভ উপস্থিতি জাহির করল। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নতুন করে শুরু হল শক্তিপরীক্ষা, যা ওয়াশিংটন সম্মেলনের ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাঞ্চুরিয়া সংকট নতুন সমস্যার জন্ম দিল। কারণ, ১৯১৮ সালের পর এই প্রথম শান্তিসুরক্ষার অছিলায় যুদ্ধ শুরু হল, নতুন করে শুরু হল ক্ষমতার রাজনীতি। অস্ত্রসজ্জিত, আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাও জাতিসঙ্ঘের ছিল না। ব্রিটেন ও আমেরিকার ওপর নির্ভর করা ছাড়া জাতিসঙ্ঘের উপায় ছিল না। কিন্তু এরা কেউই সামরিক বা আর্থিকভাবে জাপানের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় রাজী ছিল না। অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় জাপানের ওপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা চাপান পুঁজিবাদী দেশগুলো সমীচীন মনে করে নি। জাপান ও চীনে আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকা তা ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি।

পূর্ব এশিয়ায় জাপানের শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ একটি তাৎপর্য পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে। বলশেভিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানই হতে পারে সম্ভাব্য ভরসাস্থল, এমন আশাও পশ্চিমী দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, লিগ অফ নেশনসের সনদের দশম ধারায় সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা দানের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি পরবর্তীকালে লিগের অন্যতম দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে।

৮.২.৩ জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা

জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান জাতিসঙ্ঘ বা লিগ অফ নেশনসের পক্ষে পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আক্রান্ত চীনা সরকার জাতিসঙ্ঘের একাদশ ধারা অনুযায়ী আবেদন করলে কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র ঘটনাটির তদন্তের জন্য জাতিসঙ্ঘে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৩২ থেকে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এই কমিশনের কাজ শুরু হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিঘ্নিত করছে এবং চীন ও জাপানের মধ্যে শান্তিভঙ্গ করছে এমন যেকোন পরিস্থিতির অকুস্থলেই তদন্ত করা। তবে কমিশনের সীমাবদ্ধতা ছিল গোড়া থেকেই ; কেননা 'দুপক্ষের সামরিক সাজসজ্জায় হস্তক্ষেপ' করার কোন লক্ষই কমিশনের ছিল না। ব্রিটেনের লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে এর অন্তর্ভুক্ত হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির প্রতিনিধিবৃন্দ।

লিটন কমিশন কাজ শুরু করার পূর্বেই চীনে জাপানি পণ্য বয়কট শুরু হয়। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষও জারি থাকে। জাপান চীনের ইয়াংসি নদীর মোহনাস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সাংহাই বন্দর শহরটি দখল করল। অন্যদিকে লিটন কমিশন

চীনে এলে জাপানের সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের এই প্রতিনিধি দল দীর্ঘ আলোচনা শুরু করল। অবশেষে জাপানি সৈন্য সাংহাই ত্যাগ করে। অন্যদিকে, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি মদতে তৈরি হল স্বাধীন 'মাঞ্চুকুয়ো' রাজ্য যার রাজা হলে হেনরি পু-য়ি। ব্রিটেন বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কেউই এই জাপানি পুতুল সম্রাটকে মানতে প্রস্তুত ছিল না।

লিটন কমিশন কাজ শুরু করার প্রায় এক বছর পর যে প্রতিবেদন পেশ করল তাতে শুধু মাঞ্চুরিয়া সংকট নয়, চীন-জাপান সম্পর্কের সবদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হল। লিটন প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হল যে চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অভিযোগের আংশিক সত্যতা থাকলেও কোনভাবেই সেই অছিলায় জাপানের চীন আক্রমণ সমর্থনীয় নয়। উপরন্তু, মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যের 'স্বাধীনতা'কে অস্বীকার করা হল। বলা হল, চীনের অভ্যন্তরে থেকেই মাঞ্চুরিয়া স্বশাসন পেলে সংকট মিটতে পারে। লিগ অফ নেশনসের সাধারণ পরিষদের সভায় লিটন প্রতিবেদন সাদরে গৃহীত হল। প্রতিবেদনে চীন-জাপান সুসম্পর্ক তৈরির ওপর জোর দেওয়া হল। সুসম্পর্ক তৈরির প্রমাণস্বরূপ চীনা ভূখণ্ড থেকে জাপানি সৈন্যাপসারণের কথাও বলা হয়। জাতিসঙ্ঘের কোন সদস্য-রাষ্ট্র যে মাঞ্চুকুয়োকে সমর্থ বা আশ্রয় দান করতে পারবে না এ কথা লিটন প্রতিবেদনে প্রস্তাব রাখা হল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানি আগ্রাসনকে লিগ যেমন 'জাপানি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার' তাগিদে নিছকই এক 'পুলিশি অভিযান' বলে মানতে চাইল না, তেমনি এই ঘটনাকে একটি রাষ্ট্রের দ্বারা সমঝোতার প্রয়াস না করেই অন্য আরেকটি রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা বলেও চিহ্নিত করল না। জাপানের বিরুদ্ধে কোন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপান হল না। কেবল মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকৃতি না দেওয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘ অনড় রইল।

লিটন প্রতিবেদন জাতিসঙ্ঘের পরিষদে এক ভোটাভুটির মাধ্যমে ১৯৩৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, গৃহীত হল। উপস্থিত ৪৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪২ জনই এর স্বপক্ষে রায় দিলেন এবং জাপান এর বিরোধিতা করল। শ্যামদেশের (তাইল্যান্ড) প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন। এই ঘটনার সূত্র ধরে একমাস পরে জাপান লিগের সদস্যপদ ত্যাগ করল।

মাঞ্চুরিয়ার ঘটনা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় এক দশকের বেশি সময় পরে নতুন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘাতের জন্ম দিল। জাতিসঙ্ঘ প্রয়াস নিল সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান করে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার। একাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন জাতিসঙ্ঘকে অন্যত্র (যেমন দক্ষিণ আমেরিকায়) নিজস্ব ভূমিকা রাখতে সাহায্য করল। তবে মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা সব পক্ষের কাছে সন্তোষজনক হয়নি। আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, আইন এসবই মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে এসে থমকে গিয়েছিল বলে জনৈক চীনা প্রতিনিধি সখেদে মন্তব্য করেছিলেন। জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘনায়মান সংকটকে আরও ঘনীভূত করল। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্বলতর দেশগুলিকে সুরক্ষা না দিতে পারার ব্যর্থতা লিগ অফ নেশনসের মূল অঙ্গীকারটিকে গুরুত্বহীন করে তুলল। মাঞ্চুরিয়ার পর এই ঘটনার পুনরাভিনয় হল এশিয়া থেকে দূরে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় ১৯৩৪ সালে।

৮.৩ আবিসিনিয়া যুদ্ধ (১৯৩৫)

১৯৩০-এর দশকে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান এবং আবিসিনিয়া যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে একাধারে স্তম্ভিত ও আশঙ্কিত করে তুলেছিল। একে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ভাবলে ভুল হবে। ইউরোপে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের

উদ্ভব তথা জার্মানি ও ইতালির আগ্রাসী বিদেশনীতির ধারাতেই আবিসিনিয়া অভিযান ঘটে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্রমভঙ্গুর কাঠামোটি আরও একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আবিসিনিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করছিল ইতালির ক্রমপরিবর্তনশীল বিদেশনীতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির বিপর্যস্ত আর্থ-সমাজিক পরিস্থিতিতে মহাযুদ্ধে বিজয়লাভকে সার্থক মনে হয়নি। এত প্রশ্রয় পেয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ। বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত উগ্রজাতীয়তাবাদী কবি গাবরিয়েল দি'আনুনজিও ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহযোগীদের নিয়ে ডালমাশিয়া উপকূলের ফিউম বন্দরে অভিযান চালান এবং স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলের ইতালীয়দের ইতালির অন্তর্ভুক্ত করা। পরবর্তীকালে ইতালি ও যুগোশ্লাভিয়া সন্ধিস্থাপন করলে এই উগ্রজাতীয়তাবাদীরা ইতালির প্রজাতান্ত্রিক সরকারের উপর বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। কারণ আড্রিয়াটিক অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়া গঠনকে এরা ইতালিয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতেন।

অন্যদিকে, ইতালি অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানির সংযুক্তিকরণের বিরোধিতা করছিল। ইউরোপে ইতালি জার্মান-বিরোধী শিবিরেই অবস্থান করছিল। অস্ট্রিয়াই ছিল জার্মানি ও ইতালির মধ্যে প্রধান বিরোধের কারণ। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইতালির এই জার্মান-বিরোধী মনোভাব বজায় থাকে। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে হিটলার ভার্সাই চুক্তির পঞ্চম ধারায় কথিত নিরস্ত্রীকরণের শর্তটি সম্পূর্ণ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। যার আশু ফল হবে জার্মানিতে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান, জার্মান স্থলবাহিনীর বিস্তার এবং বিমানবাহিনীর গঠন প্রাথমিকভাবে ইতালি এই জার্মান সামরিক উদ্যোগের বিরোধী ছিল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাথে যৌথভাবে জার্মানির কার্যকলাপের আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা জানায়। উত্তর-পশ্চিম ইতালির পিয়েডমন্ট রাজ্যের স্ট্রেসা শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে (এপ্রিল, ১৯৩৫) ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীত্রয় ও বিদেশ সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। এর থেকে জন্ম নেয় জার্মানবিরোধী তথাকথিত 'স্ট্রেসা ফ্রন্ট'। এই ফ্রন্ট ছিল এক প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনটি প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত শেষ ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। অবশ্য এর কয়েকমাস পরে মুসোলিনি নিজেই আবিসিনিয়া অভিযান চালালে স্ট্রেসা ফ্রন্ট অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হিটলারের বিদেশনীতি ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় শক্তি ভারসাম্যে রদবদল ঘটিয়েছিল। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন ঘটেছিল ইতালির বিদেশনীতিতে। ১৯৩৫-৩৬ সালের শীতকালে ইতালি মিত্রপক্ষ ত্যাগ করে নাৎসি শিবিরে যোগদান করে। তার প্রথম প্রভাব লক্ষ্য করা গেল আবিসিনিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ইতালীয় সাম্রাজ্যের গৌরববর্ধনের জন্য এই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের বিরোধিতা করার জন্য যে শক্তি সমবায়ের প্রয়োজন ছিল তা তখনও ইউরোপে দানা বেঁধে ওঠেনি। নাৎসি বিরোধী 'স্ট্রেসা ফ্রন্ট' বিপন্ন। অসহায় লিগ অফ নেশনস। সম্মিলিত নিরাপত্তার আশ্বাস অলীক বলে প্রমাণিত হল।

আবিসিনিয়াকে নিয়ে উনিশ শতক থেকেই ইতালির আগ্রহ ছিল। আফ্রিকায় ইতালীয় স্বার্থের সে সময় ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটছিল। ১৮৯১ সালের এক চুক্তিতে ব্রিটেনও আবিসিনিয়াকে ইতালীয় 'প্রভাবাধীন এলাকা' বলে মেনে নিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের আদোয়া'র (Adowa) যুদ্ধে পরাস্ত হলেও ইতালির পক্ষে কখনোই আবিসিনিয়াকে বাদ রেখে আফ্রিকায় ক্ষমতা বিস্তারের কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। ভৌগোলিকভাবে আবিসিনিয়া ছিল ইতালির দুটি উপনিবেশের (ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড) মধ্যবর্তীস্থানে। দেশটি পশ্চাৎপদ, তবে খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। ১৯০৬ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি আবিসিনিয়ায় নিজ নিজ এলাকা মেনে চলতে সম্মত হয়। এটি ইতালির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক জয় ছিল। ১৯২০-এর দশকে ইতালির ভূমিকা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। ১৯২৩ সালে ইতালীয় সমর্থনে আবিসিনিয়ার লিগ অফ নেশনসে অন্তর্ভুক্তি

বা ১৯২৮ সালের ইতালি আবিসিনিয়া 'বন্ধুত্ব ও সমঝোতা' চুক্তি পরবর্তীকালের ইতালীয় আগ্রাসী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে নাৎসি বিদেশনীতির কল্যাণে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

ইতালীয় আগ্রাসনের সময় আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ব্যতীত একমাত্র আবিসিনিয়াই ছিল স্বাধীন দেশ। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আবিসিনিয়া ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী ওয়ালওয়াল অঞ্চলে দুপক্ষের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে কয়েকজন ইতালীয় সৈন্য মারা গেলে মুসোলিনি আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা খর্ব করতে উদ্যোগী হন। প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবী ও পরে যুদ্ধের হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আবিসিনিয়া লিগ অফ নেশনসের হস্তক্ষেপ দাবী করে। লিগ এই পরিস্থিতিতে অসহায়। ইউরোপে ফ্রান্স ইতালির বিরোধিতা করেনি এই ভরসায় যে ইতালির উত্থান ইউরোপকে এককেন্দ্রিক জার্মান অধিপত্য থেকে মুক্ত রাখবে। ব্রিটেন কোনও ভাবে ইতালির সাথে যুদ্ধে জড়াতে রাজী ছিল না। কার্যত আবিসিনিয়ায় ইতালির স্বেচ্ছাচারিতাকে ফ্রান্স স্বীকৃতি দেওয়ায় মুসোলিনির পক্ষে আবিসিনিয়াকে সম্পূর্ণ দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সহজ হয়ে যায়। বস্তুত, স্ট্রেসা সম্মেলনের পরে ইউরোপে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না জেনে মুসোলিনি তার আফ্রিকা নীতিকে কার্যকরী করতে উৎসাহিত বোধ করেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের জেইলা বন্দরটি আবিসিনিয়াকে দিয়ে তার পরিবর্তে আবিসিনিয়ার ওগাদেন অঞ্চলটি ইতালিকে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় ব্রিটেন। এই প্রকল্পটি মুসোলিনির পছন্দসই ছিল না, কারণ তা ইতালির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন মুসোলিনি। অন্যদিকে জেইলা বন্দরের মাধ্যমে স্থলবেষ্টিত আবিসিনিয়াকে সমুদ্রসান্নিধ্য দিতে ইতালি নারাজ ছিল। শেষপর্যন্ত ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান শুরু হল।

ইতালির আগ্রাসন শুরু হলে লিগের সদস্য রাষ্ট্রগুলির সামনে এক দায় এসে পড়ে। লিগের সনদের ১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে লিগের কোন একটি সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার অর্থ সকল সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। বাধ্য হয়েই লিগকে ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ (১৮ নভেম্বর, ১৯৩৫) জারি করতে হল। তবে, ইতালির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তৈলের আমদানীকে এর বাইরে রাখায় অবরোধের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। উপরন্তু, ফ্রান্স ইতালির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিমরাজি হওয়ায় অবরোধের কার্যকারিতা ছিল খুবই কম। লিগের এই দুর্বলতা আরও পরিস্ফুট হল হোর-লাভাল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

ব্রিটিশ বিদেশ সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পিয়ের লাভালের তথাকথিত হোর-লাভাল পরিকল্পনায় (৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৫) ইতালিকে তুষ্ট করতে আবিসিনিয়াকে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং প্রকল্পটির পরিসমাপ্তি হয়। এধরণের ভাবনা ক্ষুদ্র সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি দায়িত্ব পালনে লিগের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করল।

যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে ইতালি আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি। ইতালীয় বাহিনী বোমাবর্ষণকারী বিমানের সহায়তায় আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেও ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসের আগে ইতালীয় বাহিনীর তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী ইরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে থেকে যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে ইতালি এপ্রিল মাসের মধ্যে রাজধানী আদ্দিস আবাবা ও দেশের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ দখলের দিকে অগ্রসর হয়। পয়লা মে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি দেশ ছেড়ে পালান, এই আবিসিনীয় প্রতিরোধের অন্ত ঘটে। কয়েকদিনের মধ্যে ইতালীয় বাহিনী আদ্দিস আবাবা'র দখল নেয়। ৯ মে ১৯৩৬ সালে ইতালির রাজা আবিসিনিয়ার সম্রাট বলে ঘোষিত হলে দেশটি ইতালির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

ইতালির বিজয় দুটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ছিল। একদিকে লিগ অফ নেশনসের ব্যর্থতা এবং ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা ভবিষ্যতে ইউরোপের তথা বিশ্বের দেশগুলির বিশেষত কম শক্তিধর দেশগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে প্রকট করে তুলল। তবে লিগের সমস্যা সংকুল পর্বেও সদস্যরাষ্ট্রগুলি এক বিশেষ সম্মেলনে (জুলাই, ১৯৩৬) লিগের সনদের আদর্শ মেনে চলতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, যদিও তা বাস্তব রাজনীতিতে কতদূর প্রভাব ফেলল তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় মহাদেশে জার্মান বিদেশনীতি আরও একধাপ অগ্রসর হল আবিসিনিয়াকে কেন্দ্র করে কেবল যে ইতালি জার্মানির সুহৃদ হয়ে উঠল তাই নয়, জার্মানিও অস্ট্রিয়াকে নিজের সাথে 'সুংযুক্তিকরণ' করতে ইতালির কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে গেল। এতদিন ইউরোপে ইতালি ছিল স্বাধীন অস্ট্রিয়ায় সমর্থক। পরিস্থিতির সুযোগ নিতে জার্মানি রাইলন্যাণ্ড অধিকারের প্রয়াস নিল। গড়ে উঠল রোম-বার্লিন অক্ষ। ভার্সাই বা লোকার্নো, কোনও চুক্তিরই বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রইল না। আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য টলে গেল। শেষ হল জার্মানির একাকিত্ব।

৮.৪ স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)

উনিশশো ত্রিশের দশকের ইউরোপের আগ্রাসী নাৎসি ও ফাসিস্ত বিদেশনীতির একটি ক্ষেত্র যদি হয় আবিসিনিয়া, তবে অপর আর একটি ক্ষেত্র হিসাবে সহজেই স্পেনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ময়দানে আদর্শ নৈতিকভাবে যুযুধান দুই পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। নামে গৃহযুদ্ধ হলেও কার্যত এক্ষেত্রে বৈদেশিক শক্তির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। সমকালের ইউরোপের রাজনৈতিক তৎপরতায় কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল গৃহযুদ্ধকালীন স্পেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আজানিয়া (Azana) ও তার পপুলার ফ্রন্ট প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো (Franco) ও জেনারেল সানহুরহো'র (Sanhurho) নেতৃত্বে মরোক্কোয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পুর্ববর্তী পাঁচ বছর ধরে স্পেনের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সূচনা থেকে বামপন্থীরা বিশেষত সমাজবাদী দল যে সব সংস্কার আরম্ভ করেছিল তাতে স্পেনের ধর্মীয় ও ভূমধ্যকারী স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে দক্ষিনপন্থী শক্তি জয়লাভ করলেও দ্রুত শ্রমিক বিপ্লব ঘটে ও বামপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরে আসে। আইনী পথে সনাতনী সমাজকাঠামো তথা স্বার্থরক্ষা করা যাবে না বুঝতে পেরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদের প্রয়াস চলতে থাকে। সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও সাম্যবাদীদের নিয়ে গঠিত পপুলার ফ্রন্টের মুখোমুখি হয় ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী এবং ফালান্‌জে (Falange) নামে পরিচিত একটি ফাসিবাদী দল। বস্তুত এই সংঘাত সমকালীন ইউরোপীয় সমাজ ও রাজনীতির একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব ছিল। শীঘ্রই স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপীয় আদর্শগত লড়াইয়ের চেহারা নেয়।

স্পেনের পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন ছিল না। ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিল, বরং উদগ্রীব ছিল ইতালির সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য। ব্রিটেন চায়নি জার্মানি ও ইতালির সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়ে ব্রিটেনের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাক। অন্যদিকে স্পেনের বামপন্থীদের পরাজয় ব্রিটেনের আকাঙ্খিত ছিল, কেননা তাহলে মহাদেশজোড়া সাম্যবাদের ভয়ের হাত থেকে রেহাই মিলবে। ফ্রান্সও নিরপেক্ষতাপন্থী ছিল এবং স্পেনের মত পরিস্থিতি যাতে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি না হয় তারজন্য ইউরোপীয়

শক্তিগুলির মধ্যে নিরপেক্ষতাধর্মী সমঝোতায় উদ্যোগী হয়। তবে জার্মানি ইতালি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহন সত্ত্বেও নিরপেক্ষতাবাদী জোট কার্যত একটি কাগুজে সংগঠন ছিল। প্রতিটি দেশই স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন যোগায়। সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ও উপদেষ্টা প্রেরণের মাধ্যমে এই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ছয় মাসে বিদ্রোহীরা উন্নততর সামরিক শক্তির দ্বারা দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল দখল করে। এই পর্যায়ে ইতালি ও জার্মানির প্রত্যক্ষ মদতে ফ্রাঙ্কোবাহিনী মরোক্কো থেকে স্পেনে আসে। অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কো নিজেকে স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। সানহুরহো'র মৃত্যুর পর তিনিই ফ্যাসিবাদীদের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। কাদিজ, সারাগোসা, সেভিয়া ও বুরগোস শহর বিদ্রোহীদের দখলে এল। দেশের উত্তর ও পূর্বভাগে শহুরে শ্রমিক ও খনি-মজুরদের অনমনীয় মনোভাব ও অদম্য লড়াই এবং কাতালোনিয়া ও বাস্কদের স্বায়ত্বশাসনের প্রবল ইচ্ছার জোরে প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঐ অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহীদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, বিলবাও ও ভ্যালেন্সিয়া ছিল পপুলার ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ফ্রাঙ্কো পর্তুগালের সঙ্গে সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করায় রসদ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পথটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল ১৯৩৭ সালে। মাদ্রিদকে বিচ্ছিন্ন করতে বিদ্রোহীদের প্রবল প্রয়াস এ সময় ব্যর্থ হয়। মাদ্রিদ-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গুয়াদালাহারা'র যুদ্ধে মুখ্যত ইতালীয় সৈন্যসম্পন্ন ফ্রাঙ্কো বাহিনীকে পরাস্ত করে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইতালীয় 'স্বেচ্ছাসেবক' এসময় ফ্রাঙ্কোর হয়ে লড়েছিল। বিদ্রোহীরা তেরুয়েল শহর দখল করেও ধরে রাখতে বার্থ হল। তবে, উত্তর স্পেনে বাস্ক প্রভাবিত গুরুত্বপূর্ণ বিলবাও বন্দরটি তারা জুন মাসে দখল করল।

গৃহযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৩৮ সালে ইতালি ও জার্মানি অধিকতর হারে জাতীয়তাবাদী ফ্রাঙ্কোর বাহিনীকে সমর্থন করতে শুরু করল। অন্যদিকে পপুলার ফ্রন্টকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ১৯৩৭ সালের বসন্তকাল থেকেই দ্রুতহারে কমে আসছিল। জার্মান বিমানবহরের ব্যাপক সহায়তায় ফাসিস্তরা একে একে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিকে নিজেদের দখলে আনতে শুরু করল। মাদ্রিদ প্রায় সমগ্র বৎসরব্যাপী অবরোধ আক্রান্ত হয়ে রইল। সে বছরের শীতে ফ্রাঙ্কোবাহিনী কাতালান প্রতিরোধেও ভাঙন ধরাতে সমর্থ হল।

গৃহযুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে ১৯৩৯ সালে পপুলার ফ্রন্ট দ্রুত অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। ২৬ জানুয়ারি বার্সেলোনা এবং ২৮ মার্চ মাদ্রিদ ও ভ্যালেন্সিয়ার শেষ প্রজাতান্ত্রিক দুর্গগুলিও ফ্রাঙ্কোর কাছে আত্মসমর্পন করল। যুদ্ধ, অসুস্থতা ও রাজনৈতিক নিপীড়নে মারা গেলেন পাঁচ থেকে আট লক্ষ মানুষ। হাজার হাজার মানুষ হলেন নির্বাসিত। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে আধুনিক স্পেনের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার (১৯২৩-৩০ প্রথম একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলেছিল) একনায়কতান্ত্রিক শাসন ফিরে এল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে কেবল স্পেনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সকরার উৎখাত হয়নি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে উল্লেখনীয় রদবদল ঘটল। গৃহযুদ্ধের পরেই স্পেন-জার্মানি-জাপান-ইতালি সমন্বিত কমিনর্টান-বিরোধী জোটে প্রবেশ করে আগামী দিনে তার ভূমিকার ইঙ্গিত দিল। ফ্রান্স এই গৃহযুদ্ধের ফলে অবস্থানগত ভাবে সবচেয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে রইল, কেননা স্পেন-জার্মানি মৈত্রী ফ্রান্সকে উভয় দিকের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিল। জার্মান সমরবাহিনীর বিশেষত বিমানবহরের যুদ্ধকৌশল আগামী বিশ্বযুদ্ধের রণকৌশলের ইঙ্গিত রাখল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপকহারে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন। এই জনমত

গঠিত হয়েছিল পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্বপক্ষে ইন্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে লড়ছিল ইতালি ও জার্মানির ফাসি-বিরোধী ও নাৎসি বিরোধী জনগণ, সোভিয়েত জনগণ তথা বিশ্বের নানা প্রান্তের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা। ই, এইচ্. কার মন্তব্য করেছেন, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ স্পেনের মাটিতে প্রায় এক ইউরোপীয় গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। অন্যদিকে ফাসিবাদী শক্তিও সংহত হচ্ছিল। জার্মানির শক্তি সামর্থে অভিভূত মুসোলিনি ১৯৩৬ সালের এক বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন যে রোম-বার্লিন অক্ষকে কেন্দ্র করেই আগামী দিনে সহযোগিতা ও শান্তির ভিত্তিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হবে। এই রোম-বার্লিন অক্ষই আগামী দিনে অক্ষশক্তির চেহারা নেবে। বস্তুত স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে জার্মানির প্রতি ইতালির সন্দেহপূর্ণ ও অবিশ্বাসী মনোভাবকে ছাপিয়ে উঠে এক সাধারণ একমুখী সম্প্রসারণবাদ উভয় দেশের বন্ধনকে দৃঢ় করে। ইতালি জার্মানির এবং মুসোলিনি হিটলারের অধস্তন সহযোগীতে পরিণত হতে থাকেন এবং ইতালি শাঘ্রই জার্মানি ও জাপানের মধ্যে গড়ে ওঠা কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে যোগ দেয়। আবার, স্পেনের গৃহযুদ্ধের রেশ ধরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এককথায় উনিশশো ত্রিশের দশকের শেষের ইউরোপ দশকের সূচনার সময়কালের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন।

৮.৫ রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ

ইতালি, জার্মানি ও জাপানের মৈত্রী উনিশশো ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে থাকে। পরবর্তীকালে ইউরোপে তথা বিশ্ব যে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাবে তার পূর্বসূচনা ছিল এধরনের 'অক্ষের' গঠন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই দেশগুলি একজাতিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরস্পরের সহযোগীতে পরিণত হয়।

ইতালি ও জার্মানি সম্পর্কের সূচনা হয় স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় থেকে। এর পূর্বে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের সময় জার্মানি ও ইতালি নিকটতর হলেও ১৯৩৬ সালে থেকেই এই দুটি রাষ্ট্র পারস্পরিক মিত্রে পরিণত হয়। মহাদেশে অষ্ট্রিয়ার অবস্থান কী হবে—স্বায়ত্বশাসন না জার্মানির সাথে 'সংযুক্তিকরণ'—তা নিয়ে দুটি দেশের যে বিরোধ ছিল তা দ্রুত জার্মানির সপক্ষে নিষ্পত্তি লাভ করছিল। ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই স্বাক্ষরিত অস্ট্রো-জার্মান 'ভদ্রলোকের চুক্তি'কে মুসোলিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। একই সময়ে স্পেনে জার্মান সমরযন্ত্রের কুশলী কার্যক্রম মুসোলিনিকে সম্ভাব্য মিত্র খুঁজে নিতে সাহায্য করল। ১৯৩৬ সালের ১ নভেম্বর মিলান শহরে এক বক্তৃতায় মুসোলিনি বলেন, 'একটি মহান দেশ সম্প্রতি ইতালির জনগণের প্রতি বিপুল সহমর্মিতা দেখিয়েছে। আমি জার্মনির কথা বলছি। ..... এই বার্লিন-রোম রেখাটি কোন বহিরাবরণ নয়, বরং এটি একটি অক্ষ যার চারপাশে সহযোগিতা ও শান্তির ওপর ভিত্তি করে চলতে ইচ্ছুক সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র আবর্তিত হবে।' ইতালি ও জার্মানির তৎকালীন দুই বিদেশমন্ত্রী যথাক্রমে কাউন্ট গ্যালিয়াজো চিয়ানো ও ব্যারন ফন নিউরাথ ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে এক সমঝোতার মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বেই বিশ্বরাজনীতির সকল বিষয়ে সমধর্মী অবস্থান রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। এই সমঝোতা তথাকথিত 'অক্টোবর প্রোটোকল' নামে পরিচিত। এই গোপন সমঝোতায় স্পেন ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষেত্রে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া বার্লিন সমঝোতার আরও একটি গুরুত্ব ছিল এই যে, কাউন্ট চিয়ানোর মাধ্যমে একটি গোপন ব্রিটিশ নথি জার্মানির হস্তগত হয়। রোমের ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে সংগৃহীত ঐ নথিতে 'জার্মান বিপদ' সম্পর্কে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। চিয়ানোর ভাষায় ঐ নথিটির প্রচণ্ড অভিঘাত হয় ফুয়েরারের ওপর। ঐ সময় থেকেই হিটলার ব্রিটিশ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। একে একে ব্রিটেনের নানাবিধ প্রস্তাব, যথা

লিগ অফ নেশনসে জার্মানির প্রত্যাবর্তন, ফ্রান্সের সাথে জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি, রাইনল্যান্ডকে অস্ত্রমুক্ত রাখা প্রভৃতি হিটলার প্রত্যাখ্যান করেন। পাশাপাশি মুসোলিনি মিলান-বক্তৃতায় ইতালি ও জার্মানির স্বার্থের ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় রোম-বার্লিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। ব্রিটেন এই নব্য অক্ষের বিস্তারে কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইলেও তাতে বিশেষ ফল হয়নি।

রোম-বার্লিন অক্ষের ক্ষেত্রে বাড়তি উদ্যোগ দেখা যায় ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। সেপ্টেম্বর মাসে মুসোলিনি বার্লিন সফর করেন। এই সফরের দুটি ফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, জার্মানির শক্তিমত্ততায় মুগ্ধ মুসোলিনি এই সময় থেকেই হিটলারের অধস্তন শক্তিতে পরিণত হন। অর্থাৎ আগামীদিনে অক্ষশক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তিবিন্যাসে জার্মানির নিরিখে ইতালির স্থান হবে দ্বিতীয়। দ্বিতীয়ত, এই সফর ইতালি ও জার্মান সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। ঐ বছরের ৬ নভেম্বর ইতালিও জার্মানি ও জাপান-সমন্বিত কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে যোগ দিল এবং ১১ ডিসেম্বর লিগ অফ নেশনসের সদস্যপদ ত্যাগ করে জার্মানির সাথে একাসনে বসল। জার্মানির ইউরোপে মিত্রলাভ ক'রে আরও বলীয়ান হয়ে উঠতে শুরু করল। মিত্রতার নিদর্শনরূপে হিটলার রোম সফর করলেন ১৯৩৮ সালে এবং সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন।

অক্ষশক্তির উত্থানের একটি অধ্যায় যদি ইউরোপে রচিত হয় তবে অন্য একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পূর্ব এশিয়ায় চীন ও জাপানকে কেন্দ্র করে। নাৎসি ক্ষমতাদখলের সময় ও তার পরেও জার্মানি চীনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলছিল। উনিশ শতক থেকেই চীনের বিরাট বাজার জার্মান পণ্য দ্রব্যের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। জার্মান শিল্পের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের উৎস ছিল চীন। এই পরিস্থিতির রদবদল হল ১৯৩৭ সালের শেষদিক থেকে। ঐ সময়ে চীনে জাপানি সম্প্রসারণ নীতিতে ব্রিটিশ-মার্কিন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৯৩৮ সালের শুরুতে জাপানি আগ্রাসনের বিরোধী শক্তিগুলো পরস্পরের নিকটতর হয়। অন্যদিকে জার্মানি তার চীন-পন্থী নীতি ত্যাগ করে জাপানকে মিত্র রূপে পেতে আগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকে। এই রদবদলের কারণ ছিল তদানীন্তন জার্মান বিদেশ নীতি।

পূর্ব এশিয়ায় জার্মান বিদেশনীতির রদবদলের অন্তর্নিহিত কারণটি বোঝা যাবে তদানীন্তন ইউরোপে জার্মান স্বার্থের প্রসঙ্গটি বিচার করলে। ১৯৩৭ সালের ৫ নভেম্বর হস্‌বাখ স্মারকলিপিতে হিটলারের বিদেশনীতির রূপরেখাটি পরিস্ফুট হয়েছিল। জার্মানির ধারণা ছিল চীনে জাপানের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ঐ যুদ্ধে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীনের মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যস্ত রাখতে পারলে ইউরোপে জার্মানির লক্ষ্যপূরণ সহজ হবে। অর্থাৎ পূর্ব-এশিয়ায় জার্মান নীতির রদবদল ইউরোপে জার্মান স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। বিশেষত তৎকালীন জার্মান বিদেশমন্ত্রী জোয়াকিম ফন রিবেনট্রপ এই পরিকল্পনাটিকে জার্মানির উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে জরুরি মনে করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জার্মান আইনসভা রাইখস্টাগে বক্তৃতাকালে হিটলার সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাপানকে অভিনন্দন জানান এবং ঘোষণা করেন যে জার্মানি সরকারিভাবে মাঞ্চুকুয়ো সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এসময় থেকেই জাপান ও জার্মানি ক্রমশ নিকটতর হতে থাকে এবং কমিনটার্ন-বিরোধী জোটের (নভেম্বর, ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত) থেকে দৃঢ়তর ও ঘনিষ্ঠতর জোট গড়ে তুলতে চায়। জাপানের সেনা-বাহিনীর একাংশ ও অর্থনৈতিকও ইতালি ও জার্মানির মত 'সর্বহারা' শক্তিগুলোর সাথে জোট বাঁধার ওপর গুরুত্ব দেয়। এরই ফল রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ। তবে তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী কোনো ফুমিমারো তখনও সর্বতোভাবে জার্মানির সাথে সহযোগিতা করে আমেরিকাকে অখুশী করতে চাইছিলেন না। সাধারণতভাবে অবশ্য পূর্ব এশিয়ায় জার্মান নীতিবদলকে জাপান স্বাগত জানাল। রোম-বার্লিন অক্ষের সাথে জাপান ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল এবং তা ছিল ঘরে-বাইরে কঠোর জাপানি নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জার্মানি ও জাপান নিজ নিজ লক্ষ্যপূরণে পরিপূরক হয়ে উঠছিল। জার্মানি চাইছিল পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেন ও

সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্যস্ত রেখে ইউরোপে তার সুযোগ নেওয়ার, জাপান অন্যদিকে চাইছিল ইউরোপে জার্মানভীতির সাহায্যে পূর্ব এশিয়াতে সোভিয়েত ও ব্রিটিশ প্রাধান্য খর্ব করতে। উপরন্তু, জার্মান প্রশাসনিক কাঠামোটি জাপানি স্থলসৈন্য বাহিনীর বিশেষ মনঃপুত ছিল। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে এই উদ্দেশ্যে জাপানে যে আইনটি (National General Mobilization Law) পাশ করা হয় তার লক্ষ্য ছিল জাপানের জাতীয় জীবনকে সর্বতোভাবে সামরিক নৈপুণ্য অর্জনের জন্য চালনা করা। জাপানি আইনসভা ডায়েট অবশ্য এই ধরণের আইনের ব্যবহার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই একমাত্র ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু এই আইনটি জাপানকে টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রগঠনের পথে নিয়ে গেল। জাপানে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজদূত মন্তব্য করেছিলেন যে, চিরকালের জন্য জাপানি সেনাবাহিনীর কাছে স্বাধীনতা হারাতে হল।

তবে এতেও জাপানের সমস্য মিটল না। জাপানি প্রশাসনের সর্বস্তরে অক্ষশক্তির প্রতি মনোভাব এক রকম ছিল না। বিদেশমন্ত্রী আরিতা হাচিরো ও জাপানি নৌবাহিনী যেখানে জার্মানি-জাপান মিত্রতাকে সোভিয়েত-বিরোধিতার স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছিলেন, জাপানি স্থলবাহিনীর প্রধানরা সেখানে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকেও একইসাথে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন। লক্ষ্যণীয়, স্থলবাহিনীর এই আকাঙ্ক্ষা ইউরোপে জার্মান চাহিদার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। এই দ্বন্দ্বের পলে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী কোনো ফুমিমারো পদত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের অবস্থা তখন বিশেষ সুবিধানজনক নয়। উগ্র চীন নীতি জাপানকে আমেরিকার বিরোধী করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে জার্মানির সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করে জাপানি রাষ্টশক্তি বাঁচার পথ অনুসন্ধান করছিল। জাপানি স্থলবাহিনী জার্মানির সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রচনা করতে জাপান সরকারকে কার্যত বাধ্য করছিল। জাপানি বিদেশনীতি অবশ্য পুরোপুরি সফল হল না। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানিকে পাশে পাওয়ার আশা পুরোপুরি পূর্ণ হল না, কেননা ইউরোপে জার্মানি নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদেই নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ সন্ধি (আগস্ট, ১৯৩৯) রচনা করে। জাপানের কাছে এটি একটি আঘাত ছিল। চীন নীতির জন্য পশ্চিমী দেশগুলির সাথে আগেই জাপানের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, নাৎসি-সোভিয়েত সন্ধি তার সমস্যা আরও বৃদ্ধি করল।

৮.৬ তোষণনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের মনোভাবকে তোষণমুখী হিসাবে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন হিটলারকে তোষণ করতে গিয়ে অন্যান্য দেশকে সংকটাপন্ন করেছেন এই জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে। জার্মানির প্রতি ব্রিটেনের আপোসমুখী মনোভাব ব্রিটেনের তোষণনীতি হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে জার্মানির প্রতি ফ্রান্সের ভূমিকা বা মনোভঙ্গি কী ছিল তাও বিচার্য বিষয়। এ সময় ফ্রান্সের দুর্বলতা জার্মানিকে কতদূর সাহায্য করেছিল তা এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়।

৮.৬.১ ব্রিটেনের তোষণনীতি

১৯৩৭ সালে চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্ট্যানলি বল্ডউইনের স্থলাভিষিক্ত হন। তার সাথে ব্রিটিশ বিদেশনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বিদেশনীতি প্রসঙ্গে চেম্বারলেনের মতামত তার পূর্বসূরীর তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল। তিনি মনে করতে থাকেন যে, সঠিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন

দেশের একনায়কতান্ত্রিক শাসকদের অভাব অভিযোগ অনুধাবন করা উচিত এবং সেইমত তাদের তুষ্ট করতে একটি সাধারণ তোষণনীতি অনুসরণ করাই বিধেয়। চেম্বারলেনের এই ধারণা গড়ে ওঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। প্রথমত, যৌথ নিরাপত্তা ও লিগ অফ নেশনসের প্রতিশ্রুতি কার্যত অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদী ও নাৎসি শক্তির হাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশ বিপন্ন ও অধিকৃত হয়েছিল, চেম্বারলেনের নীতি সেই বিপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলত।

চেম্বারলেন তার তোষণনীতির সার্থক রূপায়নের জন্য মুসোলিনির সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে চাইলেন। তার প্রস্তাব ছিল যে, ব্রিটেন আনুষ্ঠানিক ভাবে আবিসিনিয়ায় ইতালীয় উপনিবেশকে স্বীকৃতি দেবে, প্রত্যুত্তরে ইতালি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্রিটিশ স্বার্থকে সম্মান জানাবে এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধ অবসান হওয়ার পর স্পেন থেকে তার (ইতালির) 'স্বেচ্ছাসেবকদের' সরিয়ে নেবে। যদিও বিদেশদপ্তরের এতে সায় ছিল না, কেননা এ ধরনের উদ্যোগ যৌথ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে এবং ফ্রাঙ্কো ও মুসোলিনিকে উৎসাহ ব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে। ক্রমে জাপান, জার্মানি ও ইতালির কমিনটার্ন-বিরোধী জোট সক্রিয় হয়ে উঠলে চেম্বারলেন ঐ জোটের নেতা হিটলারের প্রতি নরম মনোভাব দেখাতে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তদনুযায়ী তোষণনীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

ইতিহাস চর্চায় এই তোষণনীতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার প্রভূত পরিবর্তন বিগত কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করা গেছে। মার্টিন গিলবার্ট ও রিচার্ড গট ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বযুদ্ধের জন্য চেম্বারলেনের আপোসমুখী ও পরাজিত মনোভাবকেই দায়ী করেছিলেন। এর বিপরীতে অধ্যাপক ক্যামেরন ওয়াট সংশোধনবাদী (Revisionist) বক্তব্য পেশ করেন। তার মতে, নেভিল চেম্বারলেনকে আদ্যন্ত জার্মান তোষণকারী আখ্যা দেওয়া যায় না। অ্যান্ড্রুক্রোজিয়ের তার **দি কজেস অফ দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার** গ্রন্থে (১৯৯৭) এই অভিমত পেশ করেছেন যে হিটলারের বিদেশনীতির স্বরূপ ব্রিটেনের অজানা ছিল ; অন্তত ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেও জার্মান নীতির মূল লক্ষ্য ও ধাপে ধাপে তা অর্জনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপটি ব্রিটিশ সরকার অনুমান করতে পারেনি। ভার্সাই সন্ধির সময় থেকেই ব্রিটেন ঐ সন্ধির কয়েকটি শর্ত পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করত, বিশেষত যেগুলির জন্য ইউরোপের আর্থিক প্রগতি ব্যাহত হবে। ব্রিটেন চেয়েছিল ভার্সাই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে জার্মানিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে একাসনে বসাতে। এভাবেই ইউরোপে স্থিতিশীলতা আসতে পারে বলে ব্রিটিশ মহলে মনে করা হত। ক্রোজিয়েরের মতে, এই হল তোষণনীতি ; তোষণের অর্থ ইউরোপীয় পরিস্থিতির তোষণ তথা ইউরোপে শান্তিস্থাপন। তোষণের উদ্দেশ্য স্থিতিশীল জার্মানি গঠনের মাধ্যমে স্থিতিশীল ইউরোপ নির্মাণ। তার মতে, তোষণনীতি বলতে যেমন শান্তিরক্ষার্থে কোন দুষ্ট রাষ্ট্রে অন্যায় অযৌক্তিক দাবী পূরণ বোঝায় ব্রিটিশনীতি তার থেকে পৃথক ছিল। ১৯১৯ সাল থেকে সব ব্রিটিশ সরকারই তোষণনীতি অনুসরণ করেছে, চেম্বারলেন এই নীতির স্রষ্টা নন। তবে ১৯৩৩ সালে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী) হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশ নীতির চূড়ান্ত রূপদানে চেম্বারলেনের অবশ্যই ভূমিকা ছিল। বিগত তিন দশক ব্যাপী গবেষণার নিত্যনূতন ধারায় দেখা গেছে যে আলোচ্য সময়ের ব্রিটিশ বিদেশনীতিতে তোষণকারী ও তোষণ বিরোধী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কার্যত একে অপরের পরিপূরক। নেভিল চেম্বারলেনের তোষণনীতির সহযোগী হিসাবে ব্রিটিশ দপ্তর তথা বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ইডেন ক্রিয়াশীল ছিলেন, তোষণ বিরোধী হিসাবে নন।

৮.৬.২ তোষণনীতি ও ফ্রান্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক আসরে ব্রিটেনের নিরিখে ফ্রান্সের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় ঐ সময়ের ফরাসী বিদেশনীতির মৌল উপাদান সমূহ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যাপক আর. জে. ইয়ং দেখিয়েছেন যে তৎকালীন ফরাসী সামরিক বাহিনীর সর্বস্তরে এক 'জার্মান ভীতি' কাজ করছিল। জার্মানি আক্রমণ করলে একমাত্র ব্রিটেনের সাথে সন্ধি করেই ফ্রান্স বাঁচতে পারে, এমন একটি ধারণা ছিল যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। এজন্য তাৎক্ষণিক জার্মান ব্লিৎসক্রিগের থেকে 'দীর্ঘকালীন যুদ্ধ' চালানোর কৌশল ফরাসী সামরিক নেতাদের অধিকতর কাঙ্ক্ষিত ছিল। অর্থাৎ, সামরিকভাবে, ফ্রান্স ছিল সে সময় ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক জে. দুরোসেল ও রেনে জিরো'র মতে, নেতাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অপারগতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, সরকারি অস্থিরতা ফ্রান্সকে এক 'অবক্ষয়ের' দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফ্রান্সে নাৎসি-বিরোধী মনোভাবের যথেষ্ট উপস্থিতি সত্ত্বেও নাৎসি উত্থান রোধ করা এই জন্যই ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

উনিশশো ত্রিশের দশকের এই অস্থিরতার প্রেক্ষিতেই ফরাসী তোষণনীতির মূল দিকগুলো অনুধাবনযোগ্য।

অধ্যাপক অ্যান্টনি অ্যাডামথোয়াইট গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে ফ্রান্স কেবল বাধ্য হয়েই হিটলারের উত্থানকে মেনে নেয়নি ; কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্রান্স ব্রিটেনের থেকেও বেশিমাত্রায় তোষণনীতি অনুরণ করেছে। তার গবেষণানুসারে, ১৯৩৯ সালে ফরাসী সেনাবাহিনী জার্মান বাহিনীর তুলনায় অধিকতর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। সে সময় ব্রিটেনের সাথে যৌথ উদ্যোগে ফরাসী নেতারা সাহসী ভূমিকা রাখতে পারলে হিটলারকেও নিজস্ব পরিকল্পনা বদলাতে হত। অথচ, ফ্রান্সের দ্বারা গৃহীত আপোসমুখী মনোভাব তৃতীয় রাইখকে দুর্বল না করে তাকে শক্তিশালী করল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী ফ্রান্স যে যে ভাবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারত তার অভাব ফ্রান্সকে একের পর এক নেতৃত্বের সংকট, আর্থিক বিপর্যয় ও অভ্যন্তরীণ বিভেদের শিকার করছিল। তাই নাৎসি-বাহিনীর ফ্রান্স দখল (১৯৪০) একাধারে নাৎসি আগ্রাসন ও ফরাসী পশ্চাৎপদতার ফল। অ্যাডামথোয়াইটের মতে ১৯৩৩ সাল নাগাদও ফ্রান্স সঠিক নীতি অনুসরণ করতে পারলে ইউরোপে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু শক্তিশালী ফ্রান্স গঠনের লক্ষ্যে না অগ্রসর হয়ে তৎকালীন ফরাসী নেতৃত্ব ফ্রান্সকে ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল করে তুললেন। তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতির জন্ম দিল। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দায়দায়িত্ব থেকে ফ্রান্স মুক্তি চাইছিল। এই ধরনের আপোসমুখী নীতি কার্যত নাৎসিদেরই সহায়তা করল। বিভিন্ন শক্তির সাথে কার্যকরী মিত্রতা গড়ে তুলে, সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে এবং কর্তব্যে অবিচলতা রেখে জার্মানিকে ঠেকান যেতে পারত ; তা না করে তোষণনীতি অনুসরণ করায় অদূর ভবিষ্যতে জার্মানির কাছে ফ্রান্সের পরাধীনতার (১৯৪০-৪৪) পথ প্রশস্থ হল।

৮.৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

উনিশশো ত্রিশের দশকের অন্তিমে প্রায় সমগ্র ইউরোপ আবার এক মহাসময়ের জড়িয়ে পড়ল। ঐ দশকের মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি এই মহাযুদ্ধকে প্রায় অনিবার্য করে তুলল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হতে সাহায্য করেছিল, তার পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা ইউরোপকে যুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল।

১৯৩৭ সালের শেষভাগে নাৎসি বিদেশনীতির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানির অন্তর্গত করা। অস্ট্রিয়ায় নাৎসিদের ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলের সংখ্যালঘু জার্মানদের উদ্যোগকে জার্মানি সমর্থন ও সহায়তা করছিল। ফলে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হল এবং বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া জার্মানিক মতাবলম্বী হতে স্বীকৃত হল। ক্রমশ নাৎসি চাপের কাছে নতিস্বীকার করে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কুর্ট ফন শুশ্‌নিগ (Schuschnigg) পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (১১ মার্চ ১৯৩৮) এবং অস্ট্রিয়ার নাৎসি নেতা সেসইনকোয়ার্ট (Seyss-Inquart) তার স্থলভিষিক্ত হলেন। নবনিযুক্ত চ্যান্সেলরের আমন্ত্রণে জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে (১২ মার্চ) এবং এভাবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সংযুক্তকরণ (Anschluss) সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাটি শুধু প্রতিবেশী চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষেই বিপজ্জনক ছিল না, এটি সমগ্র ইউরোপকে নাৎসি আগ্রাসনের সামনে আরও বেশী উন্মুক্ত করেছিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান ল্যান্ডের সংখ্যালঘু জার্মানরা নাৎসি ভাবধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বশাসন ও নাৎসি মতবাদের বিজয় যাত্রা ছিল তাদের কাম্য। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস থেকেই হিটলার বলপূর্বক সুদেতান জার্মানদের সমস্যা সমাধানে উদগ্রীব হন। অন্যদিকে চোকোশ্লোভাক সরকারের প্রতি ফ্রান্স সমর্থন ব্যক্ত করায় পরিস্থিতি সঙ্কটনজক রূপ নিল। ব্রিটেন আলাপ আলোচনা মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হল। বিশেষত জার্মানির সাথে সামরিক সংঘাতে না জড়িয়ে পড়াই ছিল ব্রিটিশ বিদেশনীতির মূল লক্ষ্য। ঐ বছরের সেপ্টম্বর মাসে ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালি মিউনিখ শহরে এক চতুঃশক্তি সম্মেলনে মিলিত হল চেকোশ্লোবাকিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারণে। লক্ষ্যণীয় যে চেকোশ্লোভাকিয়া এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ; অনিমন্ত্রিত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার সাথে ১৯৩৫ সাল থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ না করতে দেওয়ার পশ্চিমী দেশগুলির এই কৌশল কার্যত জার্মানির ইচ্ছাপুরণকে বাস্তবায়িত করল। এই সম্মেলন জার্মানিকে সুদেতানল্যান্ড দখলের ছাড়পত্র দিল। হিটলারের সাথে যৌথভাবে বিখ্যাত ইঙ্গ-জার্মান ঘোষণার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ভাবলেন যে ইউরোপে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হল। ইউরোপে শান্তি এল কিন্তু এই শান্তি ক্ষণস্থায়ী হল।

মিউনিখ সঙ্কট থেকে স্পষ্ট হল যে ইউরোপে ফ্রান্স ব্রিটিশ নীতির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েছে। এরপর থেকে জার্মানির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। মিউনিখে জার্মানির সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার শীঘ্রই ব্রিটেনের কাছে অলীক বলে প্রতীয়মান হল। ঘরে-বাইরে জার্মানির আগ্রাসী আচরণ প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে তাকে আর কোনভাবেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়মনীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যাবে না। একদিকে ক্রিস্টাল নাখ্‌ট নামে কুখ্যাত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জার্মানির অভ্যন্তরে ইহুদীদের ওপর নাৎসী নারকীয়তা চলছিল ; অন্যদিকে সুদেতানল্যান্ড দখল করার পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকী অংশকেও করায়ত্ত করতে জার্মানি সচেষ্ট ছিল। নাৎসি বিদেশনীতির লক্ষ্য ছিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে দ্বিখন্ডিত বা ত্রিখন্ডিত করে জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এসময়ে অত্যন্ত অপমানজনক পরিস্থিতিতে চেক রাষ্ট্রপতি এমিল হাচা এবং বিদেশীমন্ত্রী চ্‌ভালকোভ্‌স্কি বাধ্য হলেন বার্লিনে এসে জার্মানির সাথে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে (১৫ মার্চ ১৯৩৯), যার মর্মার্থ ছিল চেক জনগণ ও দেশের নিয়তি জার্মান রাইখের কর্ণধার ফুয়েরারের পদতলে সঁপে দেওয়া। ঐ দিনই জার্মান বাহিনী চোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ দখল করল। অন্যদিকে ২৩ মার্চ জার্মান বাহিনী লিথুয়ানির মেমেল বন্দর-শহরটি দখল করল। জার্মান আগ্রাসন থেকে স্পষ্ট হল যে নাৎসি রাষ্ট্র নিছক জার্মান এলাকা দখল করে সন্তুষ্ট নয়। মেমেল বন্দরটি জার্মান অধ্যুষিত

হলেও চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান অভিযান নিঃসন্দেহে সমগ্র ইউরোপের জার্মানির পদানত হওয়ার আশঙ্কা তৈরী করল।

এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আরও এক বিশেষ মাত্রা সংযোজিত হল রুমানিয়ার প্রতি জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাবের কারণে। ব্রিটেন আশঙ্কা করল জার্মানি পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে শীঘ্রই রুমানিয়াকে উপনিবেশে পরিণত করবে। রুমানিয়ার খনিজ তেল (কৃষ্ণসাগর এলাকার) ও কৃষিজাত দ্রব্য আত্মসাৎ করে জার্মানির আর্থিক ও সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রইল। এই আশঙ্কা অমুলক বলে প্রতিপন্ন হলেও সমসাময়িক কালে ইউরোপীয় প্রশ্নে ব্রিটিশ নীতিকে প্রভাবিত করতে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এভাবেই ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে ব্রিটেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি (Policy of Guarantee) রূপায়ন শুরু করল। এর অর্থ হল এরপর থেকে জার্মানি কোন প্ররোচনা ব্যতিত আগ্রাসন করলে ব্রিটেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করবে।

ব্রিটেনের এই নীতি রূপায়নের প্রথম ক্ষেত্র হল পোল্যান্ড। এর থেকেই জন্ম নিল এক ইউএরাপীয় যুদ্ধ, কালক্রমে যা এক বিশ্বযুদ্ধের চেহারা নিল। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে থেকেই হিটলার পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডরের ওপর অতিরাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করে আসছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে পোল্যান্ডকে-কমিনটার্ন-বিরোধী জোটে সামিল করে পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপর্যস্ত করা। অথচ স্বাধীন বিদেশনীতি সম্পন্ন পোল্যান্ড এ ধরনের অধীনতামূলক মিত্রতায় জার্মানির সঙ্গে আবদ্ধ হতে রাজী ছিল না। উপরন্তু, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আশ্বাসবাণী পেয়ে পোল্যান্ড নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটল। ৭ এপ্রিল মুসোলিনি আচমকা আলবানিয়া অভিযান করে দেশটি দখল করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসনের আরও একটি নির্লজ্জ নিদর্শন হয়ে রইল ঘটনাটি। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি দেখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স গ্রীস ও রুমানিয়ার সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হল এবং যুদ্ধের প্রাক্-উদ্যোগ হিসাবে ব্রিটেনে সৈন্য বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ শুরু হল।

২৮ এপ্রিল হিটলার রাইখস্টাগে বক্তৃতাকালে জার্মানি-পোল্যান্ড অনাক্রমণ চুক্তি এবং ইঙ্গ-জার্মান নৌ-সমঝোতা বাতিল ঘোষণা করলেন। এরপর ২২ মে ইতালি ও জার্মানি 'ইস্পাতের চুক্তি' করে যুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। অন্যদিকে, ডানজিগ বন্দরটি পোল্যান্ড জার্মানিকে হস্তান্তর করতে পুরোপুরি গররাজি থাকায় জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের চুড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ডানজিগের সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান অধিবাসীরা ইতি পূর্বেই নাৎসি ভাবধারায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং বারংবার সেখানে জার্মানির সাথে যুক্ত হওয়ার দাবি উঠছিল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণের খসড়া তৈরী করে ফেলে। 'অপারেশন হোয়াইট' নামক এই অভিযান ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু করার কথা ভাবা হয়েছিল। ইতালির সাথে মিত্রতা করে জার্মানির ইতিমধ্যেই শক্তিশালি হয়ে উঠেছিল, উপরুন্ত অগাস্ট মাসে স্বাক্ষরিত নাৎসি-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি তাকে বাড়তি সুবিধা করে দিল। এই অনাক্রমণ সমঝোতার ফলে ইউরোপে নাৎসি-বিরোধী মহাজোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্হিত হল।

৮.৮ জার্মান বিদেশ নীতি (১৯৩৩-৩৯) — ইতিহাসবিদ্যার নানা ধারা

উনিশশো ত্রিশের দশকে ইউরোপের পট পরিবর্তনে জার্মান বিদেশনীতির নির্ণায়ক ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবিসিনিয়ার পরাধীনতা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ অথবা রাইনল্যান্ডের পুনঃসামরিকীকরণ হিটলারের বিদেশনীতির

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে। আগ্রাসী জার্মান পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে একাধিক মতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ১৯৫০-এর দশকে জার্মান মহাফেজখানার গোপন নথিপত্র প্রকাশিত হতে থাকলে এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পরিমার্জন হতে থাকে। ঐতিহাসবিদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে কোন ঐক্যমত্য গড়ে ওঠে না। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনে নাৎসি বিদেশনীতির ভূমিকা ও হিটলারের দায়িত্ব কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত মতগুলো এখানে আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্যবাদী ঘরানা

ইতিহাসবিদরে মধ্যে মতবিরোধের সূচনা জার্মান বিদেশনীতিতে হিটলারের ভূমিকা নিয়েই। একদল ঐতিহাসিক নাৎসি বিদেশনীতিতে হিটলারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন। এদের মতে জার্মান নীতি প্রণয়নে হিটলারের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। এই ঐতিহাসিকবৃন্দকে উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার (Internationalist School) অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর, অ্যালান বুলক, হিউ ট্রেভর-রোপার, জিওফ্রে স্টোকস্ এবং জার্মান ঐতিহাসিক এবেরহার্ড য়াকেল, ডিয়েট্রিশ আইগ্নার, আন্ড্রিয়াস হিলগ্রুবার ও ক্লাউস হিলডেব্রান্ড প্রমুখ উদ্দেশ্যবাদী ঘরানাভুক্ত। অল্পবিস্তর মতপার্থক্য সত্ত্বেও উদ্দেশ্যবাদী ঘরানার ঐতিহাসিকদের মতে হিটলারের ইচ্ছাই তৃতীয় রাইখের সব কার্যক্রমকে পরিচালিত করেছে। ১৯২৮ সালে রচিত হিটলারের দ্বিতীয় গ্রন্থে দেখা যাবে যে ঐ সময় নাগাদ জার্মান বিদেশনীতির যা উদ্দেশ্য ছিল আমৃত্যু হিটলার তার বাস্তব রূপায়ণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। হিটলারের মনোভাব তথা জার্মান বিদেশনীতির যে রূপটি গড়ে উঠছিল দুটি, প্রথমত ভার্সাই সন্ধির সমস্ত শর্ত বাতিল করা এবং পরবর্তী ধাপে সমগ্র ইউরোপে জার্মান প্রভুত্ব স্থাপন করা। এই পথকে নিষ্কন্টক করতে গেলে প্রথমে ফ্রান্স ও তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস হলে নাৎসি জার্মানির দ্বিবিধ লাভ হত। সাম্যবাদের হাত থেকে রেহাই মিলত এবং সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ইউক্রেনে বহুকাঙ্ক্ষিত জার্মান 'বাসভূমি' (Labensraum) গঠন করে ক্রমবর্ধমান জার্মান জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়া যেত। উদ্দেশ্যবাদীরা কেউ কেউ আরও মনে করেন যে, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার পর বিশ্বজয়ের প্রচেষ্টা করা। সে সংঘাত হত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জার্মানির। হিটলারের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সেই অন্তিম সমরে জার্মানিই জিতত কেননা জাতিগতভাবে জার্মানরা মার্কিনীদের তুলনায় বিশুদ্ধতর।

অ্যালান বুলকের মত

উদ্দেস্যবাদী তত্ত্ব নির্মানের একটি প্রধান উপাদান হিটলারের স্বকীয় রচনা। হিটলারের আত্মজীবনী আমার সংগ্রাম (Mein Kampf) থেকে তার মানসিকতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে অতিমাত্রায় সুযোগ সন্ধানী ও সম্প্রসারণবাদী বলা যায়। বস্তুত এর থেকে কোন সুস্পষ্ট বৈদেশিক নতি অন্বষণ দুরূহ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসির অ্যালান বুলক তাঁর **হিটলার ঃ এ স্টাডি ইন টিরানি** গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ১৯৩৩ সাল নাগাদ হিটলারের পক্ষে কোন আগাম অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিদেশনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল না, তিনি কেবল উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। জার্মান বিদেশনীতিকে সেই অর্থে হিটলার তথা নাৎসি দলের সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। জার্মানিতে হিটলারের কর্তৃত্ব স্থাপনের পর ইউরোপের অন্যত্র আধিপত্য বিস্তার ঘটানই এ জাতীয় বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যাপক বুলকের মতে, ভার্সাই সন্ধি খারিজ করা ও ইউরোপে বিজয়ের পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল নাৎসি নীতির লক্ষ্য।

এ. জে. পি. টেলরের মত

এ. জে. পি. টেলরে **দি অরিজিনস অফ দি সেকন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার** গ্রন্থে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানির দায়িত্ব আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, হিটলার তার বিদেশনীতি প্রণয়নে অসামান্য ধৈর্যের পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালেও কোন সুনির্দিষ্ট জার্মান নীতি ছিল না। ঘটনার বহতা স্রোতকে নিজের অনুকূলে টেনে আনার জন্য সুযোগসন্ধানীর মত অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা হিটলারের ছিল না। সে সময় পূর্ব ইউরোপে জার্মান সম্প্রসারণই ছিল হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হিউ ট্রেভর রোপারের মত

অধ্যাপক হিউ ট্রেভর-রোপার জার্মান বিদেশনীতির কাঠামোগত রূপটি আলোচনা করতে গিয়ে হিটলারের উদ্দেশ্যকে মুখ্যস্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রিটেন ও ইতালির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ফ্রান্সকে ধ্বংস করাই ছিল হিটলারের লক্ষ্য। এভাবে জার্মানি তার পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করে তারপর পূর্ব ইউরোপে সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করতে পারত।

জার্মান ইতিহাসবিদদের মত

জার্মান ঐতিহাসিক এবেরহার্ড য়াকেল ও ডিয়োট্রিশ আইগ্‌নারের মতে তৃতীয় রাইখের কূটনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপ এক নজরে দেখেই বোঝা যায় যে জার্মান নীতির রূপরেখাটি স্বয়ং হিটলারের মস্তিষ্কপ্রসূত। বিদেশনীতির অনুপুঙ্খ রূপটি গড়ে না উঠলেও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রাধান্য মোটামুটি ভাবে সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করেছিল ত্রিশের দশকের সূত্রপাতেই।

দুজন জার্মান গবেষক, অ্যান্ড্রিয়াস হিলগ্রুবার ও ক্লাউস হিলডেব্রান্ড, জার্মান বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে কেবল ইউরোপে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাদের মতে হিটলারের অন্তিম লক্ষ্য ছিল বিশ্বজয়, সুতরাং শেষ পর্যন্ত ইউরোপজয়ী জার্মানি ও আমেরিকার দ্বৈরথই বিশ্বের কর্তৃত্ব কার হাতে যাবে সে প্রশ্নটির সমাধান করে দিত। তবে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জিওফ্রে স্টোকসে'র মতে হিটলারের আদৌ ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর প্রধান শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের স্থলাভিষিক্ত হবে জার্মানি। এই লক্ষে 'লেবেনস্রাউম' সৃষ্টি তথ্য ইউরোপ-বিজয় সম্পূর্ণ করাই ছিল হিটলারের ইচ্ছা। তবে অন্য মতবিরোধ যাই থাক একটি ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিকগণ একমত যে হিটলারের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ছিল জার্মান রাষ্ট্রনীতির উৎসমূল।

গঠনবাদী ঘরানা

জার্মান নীতির একটি ভিন্নতর ব্যাখ্যা জোরদার হয় ১৯৬০-এর দশক থেকে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা নয়, বরং জার্মান রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন উপাদানগুলির কার্যকরণ সম্পর্কই জার্মান বিদেশনীতিকে অবয়ব দান করেছে, এ ধরনের একটি মত ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের গঠনবাদী ঘরানার (Structuralist/Functionalist School) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। গঠনবাদীরা মনে করেন যে, জার্মান বিদেশনীতির কোন সুনির্দিষ্ট রূপ কখনই ছিলনা। নাৎসি জার্মানিকে একশৈলিক, কেন্দ্রীভূত একনায়কতন্ত্র বলা চলে না, বরং তা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত এক প্রশাসনিক নৈরাজ্যের উদাহরণ। জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলার কোন নীতি প্রণয়নে সক্ষম ছিলেন না, বরং রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে যে টানাপোড়েন চলত

তারই দ্বারা হিটলার চালিত হতেন। ঐতিহাসিক ইয়ান কারশ, হান্স মমসেন, মার্টিন ব্রৎসাট, টিমোথি ম্যাসন প্রমুখকে গঠনবাদী ঘরানাভূক্ত ধরা যেতে পারে।

হান্স মমসেনের মত

হান্স মমসেনের মতে তৃতীয় রাখের বিদেশনীতি কোন 'প্রতিষ্ঠিত অগ্রাধিকার'-কে—বাস্তবায়িত করার জন্য প্রণীত হয়নি। অর্থাৎ, মমসেনের মতানুসারে, ইতিপূর্বেই স্থির হয়ে থাকা কোনো লক্ষ্যপূরণের জন্য, যথা লেবেনস্রাউম সৃষ্টি, তার জন্য নাৎসি নীতি তৈরী হয়নি। নাৎসি বিদেশনীতি আগ্রাসী হলেও তার কোন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। একে উদ্দেশ্যবিহীন সম্প্রসারণে'র নীতি বলা হয়।

মার্টিন ব্রৎসাটের মত

মার্টিন ব্রৎসাট গবেষণাতে মমসেনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। 'লেবেনস্রাউমে'র ধারণাকে ব্রৎসাট অল্পই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে হিটলার ও নাৎসি আন্দোলন যে শক্তির মুক্তি ঘটিয়েছিল তাকে ধারণা করার ক্ষেত্রে লেবেনস্রাউমের ধারণাটি স্রেফ একটি রূপক আদর্শ হিসাবে রয়ে গিয়েছিল, তার কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই। ব্রৎসাটের এই বক্তব্য উদ্দেশ্যবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ উদ্দেশ্যবাদীরা লেবেনস্রাউমকে নাৎসি বিদেশনীতির কেন্দ্রবিন্দু মনে করে থাকেন। এই রূপকটিকে ব্যবহার করে নিরবিচ্ছিন্ন, আগ্রাসী, বিদেশনীতির যুক্তিকাঠামোকে গড়ে তোলা হয়েছিল, যতক্ষণ না নাৎসি বিদেশনীতিটি স্বয়ং নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়ে, এবং 'আত্মবিধ্বংসী উন্মাদনা'য় পরিণত না হয়। ব্রৎসাটের মতে, পোল্যান্ড তথাকথিত লেবেনস্রাউমের ধারণার অন্তর্ভূক্ত না করার মধ্যে হিটলারের বিদেশনীতির অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়।

টিমোথি ম্যাসনের মত

অধ্যাপক টিমোথি ম্যাসন মত প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৩৯ সালে যে যুদ্ধ শুরু হল তার বীজ নিহিত ছিল ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগের জার্মানির অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে। তাঁর মতে, হিটলারের সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের সময়কাল, কৌশল এমনকি কৌশলগত বিমূঢ়তা সবকিছুই নির্ধারিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে লুণ্ঠনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা। যুদ্ধই লুণ্ঠনকে একাধারে ত্বরান্বিত করেছিল ও রসদ যুগিয়েছিল। ম্যাসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করতে গিয়ে যুদ্ধের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে জার্মানির অপূর্ণ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানির বেহাল রাষ্ট্রকাঠামো কিংবা 'পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত' তত্ত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করে দিয়ে ও বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে নাৎসিরা তাদের আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করতে পারত। হিটলার হয়ত ১৯৩৯ সালেই কোন বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাননি যেখানে ব্রিটেন হয়ে উঠবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ; বরং ১৯৪৩ সাল, নাগাদ, অর্থাৎ হিটলারে ক্ষমতা দখলের দশ বছর পরে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই জার্মানি ইউরোপীয় শক্তিদ্বন্দের আসরে নামতে চেয়েছিল বলে অধ্যাপক ম্যাসনের অভিমত। তা সত্ত্বেও যে জার্মানিকে আংশিক প্রস্তুত নিয়েই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল তার কারণ ১৯৩৬ সালের পর থেকেই নানা কারণে সমস্যা পেকে উঠতে থাকল। বিশেষত জার্মানি রাইনল্যান্ডে পুনঃ-সামরিকীকরণ শুরু করায় অন্যদেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা অনিবার্য হয়ে পড়ল। শ্রমের চাহিদা, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস ও সেই কারণে কাঁচামালের আমদানি হ্রাস, কৃষির বিকাশ হ্রাস ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে জার্মান আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৃহৎ সমস্যার জন্ম দিল। ম্যাসেনের মতে, এই অবস্থায় পুনঃসামরিকীকরণের চাপ জার্মানির ঘরোয়া সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেল। বস্তুত, নতুন নতুন এলাকা দখল করে কাঁচামাল,

খাদ্যদ্রব্য, যুদ্ধ সামগ্রী দখল না করতে পারলে বা যুদ্ধের প্রথমদিকে রুশ-জার্মান মৈত্রী চুক্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য না পেলে জার্মান যুদ্ধ-অর্থনীতি ১৯৩৯-৪০ সালেই ভেঙে পড়ত।

গঠনবাদী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য—বিশেষত টিমোথি ম্যাসনের গবেষণা—জার্মান বিদেশনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানিতে ভূমিকার বিশদ আলোচনা করলেও তা সব সময় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। পাশাপাশি, আন্যান্য গবেষণাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের জার্মান রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে ইতিহাসবিদদের নানা ধরনের ব্যাখ্যা একটি জটিল কালপর্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

৮.৯ সারাংশ

উনিশশো ত্রিশের দশকে পূর্ব এশিয়ায় চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আগ্রাসন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাপানের অভ্যন্তরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল সম্প্রসারণবাদী দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ। পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আগ্রাসী জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী ছিল। মাঞ্চুরিয়ার মুকদেনে চীনা অন্তর্ঘাতের দাবী করে জাপান মাঞ্চুরিয়া আকার করে এবং মাঞ্চুকুয়ো শাসনের বকলমে কার্যত নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম এধরনের আগ্রাসনে জাতিসঙ্ঘ বিচলিত হয় এবং লিটন কমিশন প্রেরণ করে। লিটন কমিশনের প্রতিবেদনে অখুশী জাপান জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে।

জাপানের ক্ষেত্রে যেমন মাঞ্চুরিয়া, ইতালির ক্ষেত্রে তা ছিল আফ্রিকায় আবিসিনিয়া। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটি দখল করে ইতালীয় সাম্রাজ্যের গৌরব বর্ধন করতে মুসোলিনি দেশটিতে অভিযান চালান। জাতিসঙ্ঘের মূল অঙ্গীকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার আশ্বাসকে উপেক্ষা করে আবিসিনিয়া দখল করা হয়। আবার, এরই সূত্র ধরে জার্মানি ও ইতালি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সন্নিকটে এল। জার্মানি ও ইতালি হয়ে উঠল পরস্পরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সমর্থক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এর পরিণত রূপ দেখা গেল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারকে উৎখাত করতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটে। নামে গৃহযুদ্ধ হলেও এটি কার্যত ইউরোপীয় যুদ্ধের চেহারা নেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ দেশ বিদেশের গণতন্ত্রী, বামপন্থীরা লড়াই করে ; অপরপক্ষে জার্মানি ও ইতালির সমর্থন ছিল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলে যুদ্ধক্ষেত্রে। এই গৃহযুদ্ধ ইতালি ও জার্মানির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ছিল। এরপর থেকেই জার্মানির নিরিখে ইতালি দ্বিতীয় সারির সহযোগীতে পরিণত হয়। যার ফল হয় রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষশক্তি।

জার্মানি, জাপান ও ইতালিকে নিয়ে গড়ে ওঠা অক্ষশক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্যে রদবদল করেছিল। ইউরোপে জার্মান-নীতির পরিবর্তন এশিয়ায় জাপানের নীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে জাপান আন্তর্জাতিক মহলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে তার সমর্থনে এগিয়ে আসে জার্মানি। অন্যদিকে, মুসোলিনি ও হিটলারের যথাক্রমে জার্মানি ও ইতালি সফর দুটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরস্পরের নিকটবর্তী করল। অক্ষশক্তির সাম্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠল কমিনটার্ন-বিরোধী জোট। অবশ্য জার্মানি ইউরোপে নিজস্বার্থ রক্ষার্থেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমন চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই ঘটনা পক্ষান্তরে জাপানের সমস্যা আরও বৃদ্ধি করল।